Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীর অধিকার ও অবস্থান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিম সুলতানা

রোলঃ 23090120728

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীর অধিকার ও অবস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিম সুলতানা

রোলঃ 23090120728

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারীর অধিকার ও অবস্থান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রিম সুলতানা, আইডিঃ 23090120728 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নারীর অধিকার ও অবস্থান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

রিম সুলতানা

আইডিঃ 23090120728

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

আদিম সূর্যের আভা : নারী সৃষ্টির প্রথম আলো 7

অবহেলার অন্ধকার থেকে মর্যাদার দীপশিখা 10

কুরআনের আয়নায় নারী : সমতার ঘোষণা 13

সমাজ ও মানবতার উন্নয়নে সমান ভূমিকা 20

জ্ঞানজ্যোতি : শিক্ষার অধিকার ও আলোকিত পথ 22

অধিকার ও স্বাধীনতা : অর্থনীতি ও সম্পদে নারীর অংশ 28

অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীর অংশ 31

মোহরানার মহিমা : বিবাহে সম্মান ও অধিকার 41

উত্তরাধিকারের সুবিচার : ন্যায্য বণ্টনের আলো 46

সদাচারের সুবাস : পারিবারিক জীবনে নারীর মর্যাদা 52

সমাজের অর্ধেক আকাশ : নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ 58

নারী অধিকারই সভ্যতার সৌন্দর্য 63

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট বিধান। কোন যুগ ও কালে সে বিধান অচল ও অকার্যকর নয়। অথচ যুগ-কালের বিবর্তনে ইসলামের বিধানকে অচল প্রমাণ করার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিষোদগার করা হয়।

তবে সত্য এটাই যে, ইসলাম মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র দিকনির্দেশনা। এতে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে শুরু করে পরিবার ও ব্যক্তিজীবনের যাবতীয় দিকনির্দেশনা। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হোক বা সামাজিক জীবন—ইসলাম প্রতিটা।

বিশেষ করে নারীর অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। ইসলাম-পূর্ব সমাজে নারী ছিল অবহেলিত ও নিপীড়িত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। অথচ ইসলাম এসে নারীকে দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার। কুরআনে বলা হয়েছে—

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساءَ كَرهًا وَلا تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما آتَيتُموهُنَّ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ فَإِن كَرِهتُموهُنَّ فَعَسى أَن تَكرَهوا شَيئًا وَيَجعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيرًا كَثيرًا

"হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।"১

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলামই মানবজীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ দিশা।
ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে নারীকে তুচ্ছ ও অবমাননার চোখে দেখা হতো, এমনকি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর

দেওয়ার মতো অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইসলাম এসে নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন—

وَلا تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ وَاسأَلُوا اللَّهَ مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمًا

"আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"২

এতে নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া নারীর জন্য শিক্ষা অর্জন, উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, মোহরানা, বিবাহে সম্মতি এবং পারিবারিক জীবনে সম্মান লাভের অধিকারও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

শুধু নারী নয়, ইসলামের বিধান প্রত্যেক মানুষের জন্য কল্যাণকর। ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব, পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীলতা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন—সবই ইসলামের মৌলিক দিকনির্দেশনা। এ কারণেই ইসলামকে বলা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

ইসলামের প্রতিটি আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার পেছনে রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা ও কল্যাণ। মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে আল্লাহ তাআলা কুরআনে যে বিধানসমূহ দিয়েছেন, তা যুগে যুগে সমানভাবে প্রযোজ্য। সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, দুর্বলদের অধিকার রক্ষা, অসহায়দের সাহায্য এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মর্যাদা সংরক্ষণ ইসলাম নিশ্চিত করেছে।

আজকের আধুনিক বিশ্ব যখন নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ভাঙন এবং সামাজিক অশান্তিতে বিপর্যস্ত, তখন ইসলামের শিক্ষা একমাত্র প্রকৃত সমাধান হতে পারে। যদি ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মেনে চলে, তবে পৃথিবী শান্তি, ন্যায় ও সমতার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।

আদিম সূর্যের আভা : নারী সৃষ্টির প্রথম আলো

মানব সৃষ্টির সূচনা মুহূর্তেই নারী ছিলেন আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি।
আদম (আ.)-এর নিঃসঙ্গ জীবনে আল্লাহ তাঁর মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেন হাওয়া (আ.)-কে — যিনি ছিলেন সঙ্গ, সহচরিতা ও মমতার প্রতীক।এই সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ ঘোষণা করেন, নারী কোনো পরাধীন সত্তা নয়; বরং পুরুষের মতোই মানবতার অর্ধাংশ, জীবনের অপরিহার্য অংশ।

নারী সৃষ্টির এই "প্রথম আলো" যেন এক আদিম সূর্যের আভা
যা মানবজীবনে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সম্পর্কের উষ্ণতা এনে দিয়েছে।
আল্লাহ নারীকে শুধুমাত্র সৃষ্টির সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে নয়,
বরং সমাজের নির্মাতা, মাতৃত্বের ধারক ও নৈতিকতার পথপ্রদর্শক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন।

ইসলাম সেই প্রাচীন সময়েই নারীর এই সৃষ্টিগত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেছে,
যেখানে অন্য সভ্যতাগুলো নারীর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন —

يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوجَها وَبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثيرًا وَنِساءً .

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।"৩

এই আয়াত প্রমাণ করে, নারী পুরুষের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।
তিনি সেই "প্রথম সূর্যের আভা", যার আলোয় মানবজীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল।
পুরুষের পাশে নারী ছিলেন জীবনের সঙ্গী, সান্ত্বনা, সহযোগী এবং পরিপূর্ণতার প্রতীক।

ইসলাম নারীকে সৃষ্টি করেছে ভালোবাসা, মমতা ও জ্ঞানের উৎস হিসেবে।তিনি মা হয়ে সন্তানকে প্রথম নৈতিক শিক্ষা দেন,তিনি বোন হয়ে ভালোবাসা ভাগ করেন,তিনি স্ত্রী হয়ে জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করেন,আর তিনি কন্যা হয়ে ঘরে আনন্দ ও আশীর্বাদ নিয়ে আসেন।

নারীকে মা হিসেবে স্বর্গের চাবি, স্ত্রী হিসেবে শান্তি ও ভালোবাসার ঠিকানা, কন্যা হিসেবে বরকতের উৎস এবং বোন হিসেবে স্নেহ ও রক্ষার প্রাপ্য সম্মান ঘোষণা করেছে ইসলাম।

ইসলাম নারীর সত্তাকে মুক্ত করেছে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে;
তার পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করেছে আলোর মতো স্বচ্ছ এবং মর্যাদার মতো দৃঢ় করে।

নারী তাই কেবল একজন মানুষ নন —
তিনি সৃষ্টির সূচনা, সমাজের স্থিতি ও সভ্যতার ভিত্তি।

কুরআনের দৃষ্টিতে নারীকে অপমান নয়, বরং সম্মান ও মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। ইসলামের পূর্বে নারীর অস্তিত্ব অন্ধকারে ঢাকা ছিল, কিন্তু ইসলাম সেই অন্ধকার ছিন্ন করে নারীকে মর্যাদার পূর্ণ আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। ইসলাম আগমনের আগে বিশ্বের বহু সমাজে নারীকে অবমাননা, দাসত্ব ও অন্ধকারের প্রতীক মনে করা হতো।কিন্তু ইসলাম এসে সেই অন্ধকার দূর করে নারীর হাতে তুলে দিয়েছে মর্যাদার প্রদীপ।

ইসলাম এলো মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে। প্রথম আলোটি জ্বলল নারীর অধিকার রক্ষার মাধ্যমে— যে নারীকে পৃথিবী একসময় অযাচিত মনে করত,ইসলাম তাকে জান্নাতের দ্বাররক্ষকের মর্যাদা দিলো।

তিনি আর কেবল নিরব দর্শক নন, বরং সমাজের গর্বিত সদস্য। নারীর সৃষ্টি কোনো কাকতাল নয়, এটি ছিল আল্লাহর পরিকল্পিত সৌন্দর্য। যেমন সূর্য তার প্রথম কিরণেই পৃথিবীকে আলো দেয়, তেমনই নারী তার স্নেহ, জ্ঞান ও ত্যাগের মাধ্যমে মানবতার প্রথম আলো জ্বালিয়েছে। তার অর্থনৈতিক অধিকার, শিক্ষা অধিকার, সামাজিক মর্যাদা, উত্তরাধিকার ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে ইসলাম মানবসভ্যতার মানচিত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
ইসলাম নারীকে কেবল গৃহের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করেনি; তাকে দিয়েছে মানবতা, অধিকার ও সম্মানিত পরিচয়। অজ্ঞতার যুগে যখন নারীকে অপমান, বঞ্চনা ও অবমূল্যায়নের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন ইসলাম তাকে উঠিয়ে এনেছে সম্মানের আসনে, শ্রদ্ধার বেদিতে, এবং সমাজের মর্যাদার শিখরে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী হলো পূর্ণাঙ্গ মানুষ— তার বুদ্ধি, তার চিন্তা, তার যোগ্যতা আল্লাহ প্রদত্ত। তাই তার মতামত অনেক মূল্যবান, তার অর্জনসমূহ অনেক সম্মানিত,তার জীবন

সুরক্ষিত,তার মর্যাদা অবিচ্ছেদ্য। সত্যিই, ইসলাম নারীর মুক্তির ঘোষণাপত্র।যেখানে নারীর সম্মান শুধু কথায় নয়,দায়িত্ব, অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠার বিধানে বাস্তবায়িত।

আজও যদি সমাজ ইসলামি নীতিকে যথার্থভাবে অনুসরণ করে,তবে কোনো নারী আর অন্ধকারে হারিয়ে যাবে না— বরং তিনি জ্বলে উঠবেন সেই সূর্যের মতো যে সূর্য সভ্যতার পথ দেখায়, মানবতার আলো ছড়ায়।

নারী হলো সৃষ্টির প্রথম প্রভাতরশ্মি — যেখান থেকে জীবন, ভালোবাসা, মানবতা ও জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে।
ইসলাম সেই আদিম সূর্যের আভাকেই আবার জাগ্রত করেছে মর্যাদা, সম্মান ও আলোর মাধ্যমে।

অবহেলার অন্ধকার থেকে মর্যাদার দীপশিখা

ইসলাম-পূর্ব যুগে নারী ছিল সর্বাধিক অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত একটি শ্রেণি।আরবের জাহেলিয়া যুগে নারীরা ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত ও অধিকারহীন। তাদেরকে মূলত পুরুষদের ভোগের বস্তু হিসেবে গণ্য করা হতো। সমাজ ও পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। নারীর সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার লাভের কোনো সুযোগ ছিল না; বরং তারা নিজেরাই ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ। বিধবা নারীকে মৃত স্বামীর নিকটাত্মীয়রা জোরপূর্বক বিয়ে করত কিংবা তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করত। নারীদের ছিল না কোন ব্যক্তিত্ব, ছিল না সম্মান, ছিল না স্বাধীনতা।

তাদের নাম রাখতে সমাজ লজ্জা বোধ করত।জন্ম থেকে মৃত্যু—তারা ছিল পুরুষের সম্পত্তি। তাদেরকে বেচা-কেনা করা হতো পশুর মতো। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও উত্তরাধিকার সম্পদের অংশ হিসেবে ভাগ করা হতো। নারীর কথা, চিন্তা, ইচ্ছা—সবই ছিল গুরুত্বহীন।

তাদের শিক্ষা গ্রহণ, জ্ঞানার্জন, কিংবা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল না। শিক্ষা ছিল নিষিদ্ধ, সম্মান ছিল স্বপ্নের মতো। এজন্য সমাজের অনেক গোষ্ঠী কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়াকে সম্মান ও মর্যাদার অংশ মনে করত। দারিদ্র্যের কারণে বড় হলে ব্যভিচারিণী কিংবা শত্রু গোত্রের লুণ্ঠিত বা অপহৃত হওয়ার ভয়ে তারা নবজাতক কন্যা সন্তানেক জীবন্ত কবর দিত। এমনকি অনেক সমাজে নারীর বিচার চাইবার অধিকার ছিল না। এর ফলে সমাজে অমানবিকতা, অবিচার এবং অশান্তি প্রকট আকার ধারণ করেছিল।

সে সময় নারীরা ঘৃণিত , অবহেলিত ও ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিবাহ প্রথা বলতে কিছুই ছিল না। সে জন্য নারীরা সন্তান লাভের স্বামীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতো| বিমাতা, ভগ্নীকে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

নারীরা জাহেলিয়াত যুগে মৃত স্বামী, পিতা বা অন্য কোন আত্মীয়স্বজনের সম্পক্তির উপর কোন রকম অধিকার ছিল না। নারীরা কোনোরকম ৰঅর্থনৈতিক কাজ অংশগ্রহণ করতে পারতো না।

আরব সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই ক্রীদদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসরা ছিল পশুর সমতুল্য। পণ্যের মতো তারা হাটবাজারে কেনাবেচা হতো। প্রভুর উপর তাদের জীবনযাপন

নির্ভর করতো। দাসদাসীদের বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ এবং লঙ্ঘন করা ছিল ভীষণ দণ্ডনীয় অপরাধ। অনেক সময় দাসদাসীরা প্রভুর উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নারীর জন্ম মানেই ছিল অভিশাপ, আর মৃত্যু ছিল স্বস্তি—
এতটাই অমানবিক ও অন্ধকারময় ছিল সেই যুগের বাস্তবতা।

অবশেষে ইসলাম আগমনের মাধ্যমে নারীর এই করুণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনে অসংখ্য বিধান নাজিল করেন। নারীকে মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রী হিসেবে সম্মানের আসনে বসানো হয়। তাদের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়, সম্পত্তিতে অংশীদার করা হয় এবং সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা সুদৃঢ় করা হয়।

ইসলাম এসে এই অন্ধকার যুগের পর্দা ছিন্ন করলো। নারী আর সম্পত্তি নয়— বরং সম্মানের অধিকারী, স্বাধীন ব্যক্তি, মর্যাদাপূর্ণ মানবসত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং বাস্তব জীবনে তা কার্যকর করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধান প্রবর্তন করেছে। কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, নারী-পুরুষ উভয়ই আল্লাহর কাছে সমান মর্যাদাপূর্ণ—তাদের তাকওয়া ও আমলই প্রকৃত পার্থক্যের কারণ।

মাতৃত্বের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন: "তোমার মায়ের পায়ের নিচেই জান্নাত।" অর্থাৎ মাকে সম্মান, যত্ন ও সেবা করার মাধ্যমে জান্নাত অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রী হিসেবে নারীকে পারিবারিক জীবনে সহযোগী ও সহধর্মিণীর মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। ইসলাম পুরুষকে স্ত্রীর প্রতি সদাচার, ভালোবাসা ও ন্যায্য আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাকে জাহেলি যুগে লজ্জা মনে করা হতো, ইসলাম তাকে রহমত ও বরকতের প্রতীক হিসেবে ঘোষণা করেছে। যে ব্যক্তি কন্যাদের ভালোবাসা, শিক্ষা ও লালন-পালন করে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার নির্ধারণ করেছে। তারা পিতার, স্বামীর কিংবা সন্তানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট অংশ পায়, যা তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—ইসলাম নারীর জ্ঞানার্জনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। হাদিসে এসেছে: "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর ফরজ।" এর মাধ্যমে নারীকে সমাজের উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

নারীর শিক্ষা ইসলাম সেই বার্তা চৌদ্দশ বছর আগেই প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীর অধিকার, সম্মান, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র আজ মানবাধিকারের নামে প্রচার করা হয়, তার ভিত্তি ইসলামী শিক্ষায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

নারীর শিক্ষা মানে শুধুই ধর্মীয় জ্ঞান নয়, বরং দুনিয়াবি জ্ঞানেও সমান অগ্রসর হওয়া। চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা, বিজ্ঞান, নেতৃত্ব—প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অবদান ইসলাম উৎসাহিত করেছে।

কারণ জ্ঞানই আলোর উৎস— আর নারী সেই আলোকে সমাজে ছড়িয়ে দেন পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত। একজন শিক্ষিত নারী গড়ে তোলেন জ্ঞানবান সন্তান, সচেতন পরিবার এবং নৈতিক সমাজ।

ইসলাম নারীর জন্য সুরক্ষা ও সম্মানের দ্বৈত নীতি প্রণয়ন করেছে— মর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনতা,সতীত্বের সঙ্গে আত্মবিশ্বাস,ভালবাসার সঙ্গে অধিকার এবং দায়িত্বের সঙ্গে সম্মান। যে সমাজ নারীর অস্তিত্ব মুছে দিত, সেই সমাজের বুকে ইসলাম নারীর জন্য ন্যায়, আলো ও মর্যাদার নতুন যুগ সূচনা করল।

নারীর হৃদয় শুধু মমতার সাগর নয়— এটি শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার দীপ্ত উৎস। তিনি যেখানেই দাঁড়ান— একটি ঘরকে জান্নাতমুখী করেন, একটি প্রজন্মকে আলোকিত করেন, একটি জাতিকে উন্নতির পথে পরিচালিত করেন।

অতএব, অবহেলার অন্ধকার যেখানে নারীর অস্তিত্বকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল, ইসলাম সেই অন্ধকার ভেদ করে নারীকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। আজকের দিনে নারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষার সর্বোত্তম ভিত্তি হলো ইসলাম, যা সত্যিকার অর্থেই নারীর জন্য মর্যাদার দীপশিখা প্রজ্বলিত করেছে।

কুরআনের আয়নায় নারী : সমতার ঘোষণা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারী দীর্ঘদিন অবহেলা ও অবমাননার শিকার ছিল। ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীর কোনো মর্যাদা বা অধিকার সমাজ স্বীকার করত না। কিন্তু ইসলাম এসে নারীর মর্যাদাকে নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুরআন নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সমতা ও ন্যায়ের ঘোষণা দিয়েছে।

ইসলাম ও বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক জীবন্ত আদর্শ স্থাপন করেছেন। মানব মন ও মানব সমাজে নারী প্রগতির গোড়াপত্তন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। ইসলামে নারীর স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক বাক-স্বাধীনতা আছে। নর-নারী উভয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে স্বীকৃত এবং কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ লাভের সম অধিকার প্রাপ্য।

যদি নারী অধিকারের কথা বলতে চাই, তাহলে স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে নারীরা পুরুষের চেয়েও অধিক পরিমাণ অধিকার ভোগ করছেন। এখানে মর্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে মানুষে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। নারীর মর্যাদা ক্ষমতা ও অধিকার পুরুষের চেয়ে বেশি। কিন্তু দায়িত্ব কম। আবার নারীর একটি দায়িত্ব আছে যা শত পুরুষের দায়িত্বের চেয়ে বড় ও ভারী। এর নাম মাতৃত্ব। এটি কোনো পুরুষ পালন করতে পারবে না। কখনো সম্ভব নয়। মর্যাদাও এমনই।

প্রতিটি শিশু ও নারী পুরুষের কাছে আমানত, তাদের ভরণপোষণ থেকে শুরু করে সবকিছুই পুরুষের উপরন্যস্ত করেছে ইসলাম। তাহলে বলা যায় ইসলাম তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে।

আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা কুরআনে নারীর সমতা নিয়ে বলেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

সৃষ্টিগত সমতা

কুরআন ঘোষণা করেছে যে নারী ও পুরুষ একই সত্তা থেকে সৃষ্টি।

إِن تَجتَنِبوا كَبائِرَ ما تُنهَونَ عَنهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّئاتِكُم وَنُدخِلكُم مُدخَلًا كَريمًا

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার সঙ্গিনীকে সেখান থেকে সৃষ্টি করেছেন।”৪

এই আয়াত মানুষকে তিনটি বড় শিক্ষায় আহ্বান করছে:

১. আল্লাহকে ভয় ও তাঁর আনুগত্য করা।
২. পুরুষ-নারী উভয়ের সৃষ্টি একই উৎস থেকে—অতএব মর্যাদায় সমান।
৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা ও সম্মান করা।

অর্থাৎ, নারী কোনো গৌণ সত্তা নয়; বরং পুরুষের মতোই পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমতা

ইবাদত, তাকওয়া ও সৎকর্মে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।

مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلونَ

“পুরুষ হোক বা নারী—যে কেউ সৎকর্ম করবে, আর সে যদি মুমিন হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই সুন্দর জীবন দান করব।” ৫

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়:
আল্লাহর কাছে পুরুষ-নারীর মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই।
ইবাদত ও সৎকর্মে উভয়েই সমান মর্যাদা ও পুরস্কারের অধিকারী।
সমানভাবে নারী-পুরুষ “হায়াতুন তাইয়্যিবা” (সুন্দর জীবন) লাভ করতে পারে।
অন্য আরেকটি আয়াতে আছে,

إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا

“নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীল নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, যারা নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে সেই পুরুষ ও সেই নারী, আর যারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে সেই পুরুষ ও সেই নারী— আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।”৬

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আধ্যাত্মিক মর্যাদা, প্রতিদান ও পুরস্কারে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই।
অর্থাৎ ঈমান ও আমলে উভয়েই সমান মর্যাদার অধিকারী।

সামাজিক সমতা

ইসলাম নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারকে সংরক্ষণ করেছে। স্ত্রী হিসেবে তার অধিকার সম্মানিত হয়েছে।

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف

“তোমরা তাদের সাথে সদাচার করে বসবাস করো।”৭

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ’লা স্বামীদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা স্ত্রীর সাথে সুন্দর ব্যবহার, ভালোবাসা, দয়া ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেন। পরিবার ও সমাজে নারীকে সম্মানের সাথে মর্যাদা দিয়ে দেখার নির্দেশ এসেছে।

অর্থনৈতিক ও উত্তরাধিকার অধিকার

নারী তার উপার্জন, মোহরানা, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ভোগ করতে পারে।

لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ نَصيبًا مَفروضًا

"পুরুষদের জন্য রয়েছে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয় যা রেখে যান তার অংশ, আর নারীদের জন্যও রয়েছে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয় যা রেখে যান তার অংশ।" ৮

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে শুধু পুরুষই নয়, নারীরও নির্ধারিত অধিকার আছে।
অর্থাৎ সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকারেও নারী বঞ্চিত নয়।

মানবিক মর্যাদা ও সম্মান

কন্যা সন্তান জন্মকে যে লজ্জাজনক ভাবা হতো, ইসলাম সেটিকে গৌরব ও আনন্দে রূপ দিয়েছে।

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت

"যে ব্যক্তি কন্যাসন্তানকে জীবিত কবর দিত, তাকে সে (কন্যা) কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবে—কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?"৯

এই আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা আরবের জাহেলি যুগের সেই অমানবিক প্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যখন লোকেরা কন্যাশিশু জন্মালে লজ্জা ও অপমানের ভয়ে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করত। কিয়ামতের দিন সেই নিরীহ শিশুদেরকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায়ের বিচার হবে।
অর্থাৎ, নারীর জীবন ও মর্যাদা সংরক্ষণ কুরআনের মৌলিক শিক্ষা।

শিক্ষার অধিকার ও জ্ঞান অর্জনে সমতা

কুরআনে বারবার জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

"বলুন: যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?"১০

এই আয়াতে জ্ঞান এবং বোঝাপড়ার গুরুত্বকে আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করেছেন। নারী-পুরুষ উভয়ই জ্ঞান অর্জনের অধিকারী, তাই কেউ লিঙ্গের কারণে জ্ঞান অর্জনে পিছিয়ে নয়।শিক্ষা ও জ্ঞান নারী-পুরুষকে সমান মর্যাদা দেয়, যা সমাজে ন্যায় ও সমতার ভিত্তি।

কর্ম ও দায়িত্বে সমতা

নারীর কাজ, ভূমিকা ও দায়িত্বকেও কুরআন স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা সংসার, সমাজ ও মানবতার উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن
ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ

"অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের প্রার্থনা কবুল করলেন—'আমি কোনো কর্মীর কাজ নষ্ট করি না—সে পুরুষ হোক বা নারী; তোমরা একে অপরের অংশ।"১১

এই আয়াত প্রমাণ করে যে নারী-পুরুষ উভয়ই কর্মের জন্য সমান দায়িত্ব ও প্রতিদান প্রাপ্য।এখানে কোনো লিঙ্গভেদ নেই; সৎকর্মের মূল্য নির্ধারণ হয় কর্মের ভিত্তিতে, লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়।এটি ইসলামে সমতা ও ন্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে প্রতিফলিত করে।

মর্যাদা রক্ষায় সমতা

কুরআন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা ও শালীনতার বিধান দিয়েছে।

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن.۝

"মুমিন পুরুষদের বলো তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে ও লজ্জাস্থান হেফাজত করে। ... আর মুমিন নারীদের বলো তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে ও লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"১২

এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তায়ালা বুঝিয়েছেন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই নৈতিক দায়িত্ব ও লজ্জাস্থান রক্ষা করাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।এটি কেবল শারীরিক আচার নয়, বরং সমাজে মর্যাদা ও সম্মানের রক্ষার নির্দেশ।নারীর জন্য খুমুর বা পোশাকের বিধান সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য।নারী-পুরুষ উভয়ই সমাজে সততার, সুশৃঙ্খল আচরণের এবং নৈতিকতার অংশীদার।এখানে বোঝা যায়, নারী-পুরুষ উভয়ের মর্যাদা রক্ষায় সমান দায়িত্ব রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে মর্যাদা ও অধিকার

স্ত্রী শুধু স্বামীকে সহচরী নয়, বরং পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ সম্পর্ককে গড়ে দিয়েছেন।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۝

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তোমাদের জন্য তিনি তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"১৩

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষে-মানুষে বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভালোবাসা, দয়া ও শান্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন।নারী ও পুরুষ একে অপরের

পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা (মাওয়াদ্দাহ) ও দয়া (রহমাহ) — এই দুটি গুণ সমাজে শান্তি ও স্থিতি আনে।এতে প্রমাণিত হয়, দাম্পত্য জীবনে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান মর্যাদার অংশীদার।

সমাজ ও মানবতার উন্নয়নে সমান ভূমিকা

কুরআন নারীকে সমাজের সক্রিয় অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। সমাজের সংস্কার, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানবতার সেবায় নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা অপরিহার্য।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী—তারা একে অপরের সহযোগী। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।”১৪

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষ উভয়কে একই দায়িত্ব ও মর্যাদায় স্থাপন করেছেন—সমাজে সৎ কাজ প্রতিষ্ঠা করা,অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা, ইবাদত আদায় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। এখানে নারী-পুরুষকে সমানভাবে সমাজের সংস্কারক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলাই নারীদের জন্য তাদের প্রকৃত সম্মান মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছেন।তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারী ও পুরুষ কখনোই সমান হতে পারে না। কোন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বেশি আবার কোন ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা বেশি। কিছু কাজ আছে যে গুলো নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা পুরুষরা করতে সক্ষম নয়, আবার কিছু আছে যেগুলো পুরুষদের ক্ষেতরে প্রযোজ্য যা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারী ও পুরুষদের এ ধরনের ক্ষেত্র বিশেষ পার্থক্যকে অস্বীকার করার কোন ভিত্তি নাই। যারা এ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে , তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা কোন অবিবেচকের কাজ হবে না।

আল্লাহ তাআলা পুরুষকে সৃষ্টিগতভাবে শারীরিক ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতৃব দিয়েছেন। পুরুষ অধিক উপযুক্ত উপার্জন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে। বিশেষভাবে পরিবারকে এবং সাধারণভাবে জাতিকে। এ কারণেই পুরুষের ওপর নারীকে ভরণপোষণ দেওয়া ফরজ করা হয়েছে। আর এ কারণেই পুরুষ নারীদের পরিচালক।

অধিকার এমন বিষয় যার মাঝে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। আর মর্যাদা হলো অভিভাবকত্ব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পুরুষকে নারীর ওপর মর্যাদাবান করেছেন।
আল্লাহ তাআলা পুরুষকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন এবং পুরুষকে এমনিকিছু বিষয়ের কারণে নারী থেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বানিয়েছেন, যা প্রকৃতি কামনা করে। তা ছাড়া এমনিকিছু বিধি-

বিধানের কারণে; শরিয়ত পুরুষকে যেগুলোর যোগ্য মনে করে যেমন, পুরুষকে পরিবারের ভরণপোষণ দেওয়া এবং রক্ষণবেক্ষণ করার ওপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পুরুষ তার স্ত্রীকে মোহর দেয় এবং তার ওপর আবশ্যক হলো, নারীর ভরণপাষণ দেওয়া আর এটাই পুরুষকে নারীর ওপর উচ্চমর্যাদা দান করেছে।

যখন একটি দল চাই তা ছোট হোক কিংবা বড়, তাদের নেতৃতৃ দেওয়ার জন্য, তাদের কার্যসমূহ পরিচালনা করার জন্য এবং তাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও সুবিন্যস্ত করার জন্য একিটি দলপতির প্রয়োজন হয়। এ থেকেই পুরুষের ওপর নারীর মর্যাদার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝতে পারি।

জ্ঞানজ্যোতি : শিক্ষার অধিকার ও আলোকিত পথ

শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল উৎস হলেন আল্লাহ। নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের কাছে শিক্ষা ও জ্ঞান পৌঁছে। আল্লাহ হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। এভাবে বিকশিত বুদ্ধি দ্বারা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে থাকে। মানুষের সামনে তখন আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যে লুক্কায়িত অনেক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। অজানা বহু বিষয় সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। সে অনেক কিছু আবিষ্কার করে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলে। অতএব, আল্লাহ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বলেই মানুষ পৃথিবীকে সুশোভিত, সুসজ্জিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হলেন নবী ও রাসূলগণ। যুগে যুগে মানুষেরা তাঁদের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছে। নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মদ (ﷺ) । যে মহান আল্লাহ তাঁকে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর শিক্ষাদানের পাঠ্যসূচীও আল্লাহ পাকই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো, তাদেরকে পবিত্র করা এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করতে উৎসাহ দেয়। কুরআনের প্রথম শব্দই ছিল — "اقرأ" (পড়ো) — যা মানব জাতিকে শিক্ষা ও চিন্তার পথে আহ্বান জানায়।

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞান অর্জন সমানভাবে ফরজ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের ওপর ফরজ।"১৫

এর অর্থ হলো, শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ নয়, বরং সবার জন্য আল্লাহর নির্দেশে সমান সুযোগ ও দায়িত্ব।

আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?”১৬

এই আয়াত স্পষ্টভাবে বোঝায়, জ্ঞানই মানুষকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়—
নারী হোক বা পুরুষ, উভয়ের জন্যই জ্ঞান হচ্ছে মর্যাদার দীপশিখা।
ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা:
১. নারী শিক্ষা শুধু তার নিজের উন্নতির জন্য নয়, বরং পুরো পরিবারের ও সমাজের আলোকিত হওয়ার পথ।
২. শিক্ষিত নারীই সন্তানের প্রথম শিক্ষক, সমাজের নৈতিক ভিত্তি ও উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।
৩. ইসলাম নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছে—তার চিন্তা, মতামত ও সিদ্ধান্তের অধিকার দিয়েছে।

ইসলামে নারীদের শিক্ষাক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আল কুরআনে সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচিটি আয়াত ওই আয়াতে আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ.خَلَقَ الإِنسانَ مِن عَلَقٍ.اقرَأ وَرَبُّكَ الأَكرَمُ.الَّذي عَلَّمَ بِالقَلَمِ.عَلَّمَ الإِنسانَ ما لَم يَعلَم

“পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ থেকে।পড়, আর তোমার রব মহামহিম।যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।”১৭

এ কথাগুলো ছিল আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগের। যখন নারীদের কোনোরকম অধিকার ছিলো না। শারীরিক সম্পদ ছাড়া তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। ইসলাম ওই সময় থেকেই নারী-শিক্ষার ওপর জোর দয়েছে। যে সময় সমগ্র পৃথিবীতে নারী-শিক্ষার কোনো চিহ্নমাত্র ছিলো না।

সাহাবায়ে কেরামের আমলে আমরা দেখেছি অনেক আলেমা মহিলা ছিলেন। এর প্রধানতম উদাহরণ তো হযরত আয়েশা (রাঃ)। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কন্যা এবং উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে গণ্য ছিলেন। হযরত য়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম এমন কি খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করতেন। তাঁর

উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন ওরওয়া বিন যুবায়ের। তিনি বলেন, তাফসির, ফারায়েয, হালাল-হারাম, সাহিত্য, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর চেয়ে বড়ো আলিমা আমি আর দেখিনি।তিনি শুধু দ্বীনের জ্ঞানেই বিদূষী ছিলেন না, তিনি চিকৎসাশাস্ত্রেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে যেসব মানুষ আসত, তাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথাবার্তাগুলো শুনে মুখস্থ করে নিতেন। অংকশা্ত্রেও তাঁর ৱযেথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এমন অনেক সময় মিরাস সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছে ছুটে আসতেন মিরাসের মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তিনি শরিয়তসম্মতভাবে সব ওয়ারিসের অংশ নির্ভলভাবে বলে দিতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, সাধারণ সাহাবীরা কেয়াস ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁর দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছেন। অনেকবার তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছ থেকে ১২২১ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু মুসা আশ আরি (রাঃ) যিনি নিজেই একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন, বলতেন, যখন সাহাবায়ে কেরামের কোনো বিষয় অজানা থাকত, আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাদের দিকনির্দেশ করতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, ৮৮ জন আলেম তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ওস্তাদের ওস্তাদ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ছাড়া আরও বহু সংখ্যক মিহিলা সাহাবীর ইলেমের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়া (রাঃ) ফেকাহর জ্ঞানে বিদূষী ছিলেন। ইমাম নববীর ভাষা থেকে জানা যায়, তিনি সে সময়ের সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ আলেমা ছিলেন। এরূপ উদাহরণ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা তাঁর সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেন, ৩২ জন আলেম তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। হযরত ফাতেমা বিনতে কায়িস (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়, একদিন তাঁর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর কোনো একটি মাসয়ালা নিয়ে তর্ক হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তাঁকে ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। ফাতেমা বিনতে কায়স প্রথম দিকের মুহাজির ছিলেন এবং গভীর জ্ঞান রাখতেন।

ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারী জাতিকে শুধু সুযোগই দেয়নি বরং ফরয করে দিয়েছে। পুরুষগণ যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ‘ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করতো, তেমনি মহিলাদের জন্যও ‘ইলমে দীনের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন।

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ্‌ বুখারী গ্রন্থে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবে'য়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীদের 'ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে'য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"১৮

এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ "এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।" শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের 'ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

লেখাপড়া, বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য কিতাব বা গ্রন্থ অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ) কে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেনঃ

كِتابٌ أَنزَلناهُ إِلَيكَ لِتُخرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ بِإِذنِ رَبِّهِم إِلى صِراطِ العَزيزِ الحَميدِ

"এই কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।"১৯

পৃথিবীতে সব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে এক একটা সম্পদ। আর এ সম্পদের মধ্য হতে সেরা সম্পদ হলো— নারী । রাসূলে কারিম (ﷺ) ইরশাদ করেন—

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

অর্থাৎ—দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ, আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হলো পূর্ণশিলা নারী।২০

মূল্যবান সম্পদ যেভাবে সংরক্ষণে অবহেলা হলে অথবা ব্যবহারে ত্রুটি হলে ঘটে অনিষ্টতা, ঠিক তেমনিভাবে নারীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং মূল্যবান জিনিসের মতো অতি মূল্যবান নারীকেও থাকতে হবে তার নির্দিষ্ট বলয়ে। নারী হীরা—মুক্তার চেয়েও বহুগুণ দামী। সুতরাং নারীর জন্য যেভাবে শিক্ষা জরুরী, ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষা দানের পরিবেশ ও পদ্ধতিও হতে হবে শরীয়ত সম্মত, নববী মানহাজ অনুযায়ী। শিক্ষার কারিকুলাম হতে হবে এমন যেখানে একজন নারী বাস্তবিক অর্থে'ই পরিণত হবে পৃথিবীর সেরা সম্পদে।

তার শিক্ষার ভিত্তি হবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ভিত্তিক এমন এক মানহাজ, যাতে সে মন থেকেই শরীয়তের পূর্ণ অনুসারি হবে, তার জবান হবে সংযত, সে হবে শরয়ী পর্দায় অভ্যস্ত, স্বামীর অনুগত, হবে সন্তান লালন—পালনে আন্তরিক, রান্না—বান্নাসহ ঘরোয়া কাজকর্মে সুদক্ষ এবং সন্তান প্রতিপালনসহ তার এবাদত বন্দেগিগুলোর শরযী বিধান সম্পর্কে সে হবে পূর্ণ জ্ঞাত।

বর্তমান যুগে নারী শিক্ষা একটি দেশের উন্নয়ন ও সভ্যতার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী শিক্ষিত না হলে সমাজের অর্ধেক অংশ অন্ধকারে থেকে যায়। কারণ — শিক্ষিত নারী মানেই শিক্ষিত পরিবার, আর শিক্ষিত পরিবার মানেই উন্নত সমাজ।ইসলাম নারীকে শিক্ষার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের ওপর ফরজ।”২১

কুরআনে বলা হয়েছে —

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?”২২

অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞান সমানভাবে প্রয়োজনীয়।

আজকের সমাজে নারী শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, বরং
শিশুর প্রথম শিক্ষক হিসেবে মায়ের জ্ঞানই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করে।শিক্ষিত নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়, পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশ নেয়, সমাজে অবদান রাখে।নারী শিক্ষা সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য, ও নৈতিকতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যদিও এখন অনেক নারী শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে,
তবুও গ্রামীণ ও দরিদ্র অঞ্চলে এখনও নারী শিক্ষায় বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্য ও সামাজিক কুসংস্কার বাধা হিসেবে রয়েছে।
তাই শিক্ষা শুধু সুযোগ নয়, বরং প্রতিটি নারীর মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা জরুরি।

নারী শিক্ষা শুধু নারীর নয়, পুরো সমাজের মুক্তির পথ।
কুরআন ও ইসলাম নারীকে জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল হতে উৎসাহ দিয়েছে,
আর আধুনিক সমাজে এই আলোই উন্নতির সর্বোচ্চ ভিত্তি।

আজকের বিশ্বে নারী শিক্ষা জাতি গঠনের অন্যতম চাবিকাঠি। একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানকে নৈতিকতা, মানবতা ও জ্ঞানের আলোয় গড়ে তোলে। ফলে নারী শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত অধিকার নয়, এটি সমাজ ও মানবতার কল্যাণের আলোকিত পথ।

শিক্ষা হলো আল্লাহপ্রদত্ত এক আলো, আর নারী যখন সেই আলো গ্রহণ করে, তখন সমাজের অন্ধকার দূর হয়।
তাই নারীর শিক্ষার অধিকার রক্ষা করা মানে সমাজকে আলোকিত করা।

অধিকার ও স্বাধীনতা : অর্থনীতি ও সম্পদে নারীর অংশ

ইসলামের আগমনের আগে নারী ছিল সম্পদের অংশ, সম্পদের মালিক নয়।
তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, নিজের উপার্জন বা সম্পদের উপর তার কোনো অধিকার ছিল না।
কিন্তু ইসলাম এসে এই অন্যায় ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়।
নারীকে দিয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সম্পদের অধিকার, যা সে সময়ের জন্য এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ছিল।

ইসলামের আগমন নারীর আর্থিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। সেই সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতায়ই নারীকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো,কিন্তু ইসলাম ঘোষণা করলো — নারী নিজেই একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং তার সম্পদের ওপর তার পূর্ণ মালিকানা আছে।

ইসলামের পূর্বে— নারীরা উত্তরাধিকার পেত না, পিতার পরিবার ও স্বামীর পরিবার উভয় জায়গাতেই অধিকারহীন ছিল, নিজের উপার্জন থাকলেও তা দখল করে নিত পুরুষরা এবং নারীর অর্থকে গোনাহ মনে করা হতো, সম্মান নয়।

ইসলাম এসে আলোর পথ দেখালো। নারীর উত্তরাধিকার নির্ধারিত হলো। তার উপার্জন ও সম্পদ তার একক সম্পত্তি হিসেবে নিশ্চিত হলো। কেউ তার সম্পদ ছুঁতে পারবে না—এ আইন দ্বারা সুরক্ষিত হলো। স্বামীর ওপর পরিবারের ব্যয়ভার বাধ্যতামূলক করা হলো আর নারীর সম্পদ রইলো শুধুই তার নিজের মোহর (দেনমোহর)কে নারীর প্রাপ্য সুরক্ষিত অর্থ হিসেবে নির্ধারণ করা হলো।
এটিই ছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও বাস্তবায়ন।

১. সম্পদের মালিকানা
ইসলাম নারীকে তার নিজের সম্পদের পূর্ণ মালিকানা দিয়েছে।
তিনি নিজের উপার্জন, মোহরানা, উত্তরাধিকার কিংবা দান হিসেবে পাওয়া সম্পদ—
সবকিছুর উপর স্বাধীনভাবে অধিকার রাখেন।

আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা কুরআনে বলে:

لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ نَصيبًا مَفروضًا

"পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ- তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক- নির্ধারিত হারে।"২৩

এই আয়াত ঘোষণা করে— নারীও পুরুষের মতো সম্পদের উত্তরাধিকারী।
এটি মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারীর অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করে।

২. উপার্জনের অধিকার
ইসলাম নারীর পরিশ্রম ও উপার্জনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
তিনি চাইলে ব্যবসা, কৃষি, শিক্ষা বা অন্য বৈধ পেশায় যুক্ত হতে পারেন।তার উপার্জন সম্পূর্ণ তার নিজের।

আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা বলেন—

وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

“পুরুষের জন্য রয়েছে তার অর্জিত (কাজের) প্রতিদান,এবং নারীর জন্যও রয়েছে তার অর্জিত (কাজের) প্রতিদান।”২৪

অর্থাৎ নারী তার কাজের উপযুক্ত মর্যাদা ও প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য।

৩. মোহরানা ও আর্থিক সুরক্ষা
বিবাহে নারীকে দেওয়া হয় মোহরানা (মাহর), যা তার আর্থিক সুরক্ষার প্রতীক।
এটি স্বামীর দায়িত্ব এবং কেবল নারীর নিজের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়।

আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহরানা আনন্দের সাথে প্রদান করো।"২৫

এটি নারীর প্রতি সম্মান ও নিরাপত্তার প্রকাশ, কোনো করুণা নয়।

৪. আধুনিক সমাজে এর প্রভাব

আজকের দিনে এই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তিনি ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, উদ্যোক্তা—সবক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছেন।
ইসলাম তাকে দিয়েছে পরিশ্রমের স্বাধীনতা ও মর্যাদা,
যা তার আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতার পথে আলোকবর্তিকা হয়ে কাজ করছে।

নারী উত্তরাধিকার সূত্রে যা পায়, তা তার নিজের সম্পদ।
কেউ— এমনকি তার স্বামী বা ভাই— তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
তিনি তা সংরক্ষণ, বিনিয়োগ বা দান— নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারেন।
ইসলামের এই নিয়ম সমাজে সম্পদের ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।
এটি নারীর অর্থনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে,
তাকে পরিবার ও সমাজে সম্মানজনক ও মর্যাদাবান অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে।
অর্থনীতি ও সম্পদে নারীর অংশ তাদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের জন্য অপরিহার্য। এতে সম্পত্তির মালিকানা, ন্যায্য মজুরি, সমান কাজের সুযোগ এবং আর্থিক স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম, সংস্কৃতি ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে অনেক ক্ষেত্রে নারীদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সামগ্রিক অবস্থানকে দুর্বল করে তোলে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীর অংশ

১.সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকার: নারীদের সম্পত্তির মালিকানা এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

২.ন্যায্য মজুরি: কর্মক্ষেত্রে সমান কাজ, সমান মজুরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩.চাকরির সুযোগ: সরকার ও বেসরকারি খাতে বিভিন্ন পেশায়, এমনকি সামরিক বাহিনীতেও অংশগ্রহণের অধিকার নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

৪.আর্থিক স্বাধীনতা: অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানে অভাব থেকে মুক্তি এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকা স্বীকৃতি দিয়েছে।
নারী উপার্জন করতে পারে, সম্পত্তির মালিক হতে পারে, ব্যবসা করতে পারে এবং তার উপার্জনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

তবে ইসলাম নিশ্চিত করেছে—নারীর কাজ তার মর্যাদা, নিরাপত্তা ও পরিবারের ভারসাম্য বজায় রাখে।

ইসলাম নারীকে শুধু সম্মানিত করেই থেমে থাকেনি,
বরং দিয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পরিশ্রমের অধিকার।
নারী সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আর তার কর্ম ও রোজগার জীবনের রঙিন পালক,
যা তাকে আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদার আলোয় উজ্জ্বল করে তোলে।

কাজ ও উপার্জনের অধিকার

ইসলাম নারীর কাজ করার ও উপার্জনের স্বাধীনতা স্বীকার করেছে।
তিনি বৈধ (হালাল) উপায়ে কাজ করে যা উপার্জন করেন,
তা সম্পূর্ণ তার নিজের সম্পত্তি—

কেউ, এমনকি তার স্বামী বা পরিবারও, তাতে অধিকার রাখে না।

আল্লাহ বলেন —

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ

"পুরুষের জন্য রয়েছে তার অর্জিত কাজের প্রতিদান,
এবং নারীর জন্যও রয়েছে তার অর্জিত কাজের প্রতিদান।"২৬

এই আয়াতই নারীর রোজগার ও পরিশ্রমের ন্যায্য স্বীকৃতি দিয়েছে।

নারীর চাকরি বৈধ হওয়ার শর্ত

নারীর চাকরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলো, কী কী শর্তের ভিত্তিতে এটা জায়েয হবে।
এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে :
১. পর্দার বিধান মানা।
২. ফ্রি মিক্সিং বা নর-নারীর অবাধ মেলামেশা পরিহার করা।
৩. অভিভাবকের অনুমতি থাকা।

পর্দার বিধান

চেহারা আবৃত বা অনাবৃত রাখার বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত এটাই যে, মৌলিকভাবে চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে বর্তমান পাপাচার ও অশ্লীলতার যুগে ফেতনার আশঙ্কায় নারীর চেহারা আবৃত রাখা ওয়াজিব। পরবর্তী সময়ের হানাফি ফিকিহদের মতামত এটাই।মপবিত্র কুরআনে আছে—

وَإِذا سَأَلتُموهُنَّ مَتاعًا فَاسأَلوهُنَّ مِن وَراءِ حِجابٍ ذٰلِكُم أَطهَرُ لِقُلوبِكُم وَقُلوبِهِنَّ

"তোমরা তাদের (নবীপত্নীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।"২৭

এই আয়াত থেকেও বোঝা যায়, নারীর দেহের কোনো অংশই পর্দার বিধানের বাইরে নয়| উম্মুল মুমিনিনদের আমলও তা প্রমাণ করে|

এই আয়াতে যখন পর্দার বিধানকে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মুল মুমিনিনদের ৰজন্যও অধিকতর পবিত্রতার উপায় বলা হয়েছে।

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدنىٰ أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا

“হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবে*র কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”২৮

এই আয়াতে নারীদেরকে জিলবাৰ ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হচ্ছে। জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে। জিলবাব মানে চাদর। কেউ কেউ বলেন, এটা এক ধরনের অবগুণ্ঠন, যার দ্বারা নারীরা তাদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখে| জিলবাব বর্তমান সময়ের বোরকা-নিকাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যার মাধ্যমে চেহারাও ঢেকে যায়।

আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা আরো বলেন,

وَقُل لِلمُؤمِناتِ يَغضُضنَ مِن أَبصارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُروجَهُنَّ وَلا يُبدينَ زينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنها

“(হে নবী,) মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে| যেটুকু সাধারণত প্রকাশিত হয়, তা ছাড়া নারীরা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে|”২৯

এই আয়াত অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর মুখমণ্ডলসহ পূর্ণ দেহ আবৃত রাখা অপরিহার্য। তাই ফেতনার যুগে নারীর পর্দা করা আবশ্যক।

ফ্রি মিক্সিং

চাকরির দ্বিতীয় জরুরি শর্তটি হলো, কোনো পুরুষের সাথে নারী যেন একাকী না থাকে অথবা ফ্রি মিক্সিং না হয়।ইসলাম নারী-পুরুষের যোগাযোগ নিষিদ্ধ করেনি, বরং সীমাহীন ও উদ্দেশ্যহীন মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। মুহাম্মদ (ﷺ) অসংখ্য হাদীসে গাইরে মাহরাম নারী ও পুরুষকে একে অপরের সাথে নির্জনে থাকতে নিষেধ করেছেন। যেমন :

হযরত আবদুল্লাহ ইবেন আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত:

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَان. ِ

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাহিহ ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আজকের পর থেকে কোনো পুরুষ তার সঙ্গে (কমপক্ষে) একজন বা দুজন পুরুষ ছাড়া ওই মহিলার নিকট যাবে নাৰ যার স্বামী উপস্থিত নেই |'৩০

হযরত উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বির্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ " الْحَمْوُ الْمَوْت. " ُ

সাবধান, তোমরা নারীদের নিকট গমন করা থেকে বিরত থাকো। তখন আনসারী এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, দেবর সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য|'৩১

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

" أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم. "ٍ

‘কোনো পুরুষ কোনো বিবাহিতা নারীর সাথে কিছুতেই রাত্রিযাপন করবে নাৰ তবে যদি সে তার স্বামী বা মাহরাম হয়।'৩২

জাবের রা.-এর বর্ণনায় বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সাধারণত অবিবাহিতা নারীদের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে লোকেরাৰনিজ থেকেই বিরত থাকে। আর বিবাহিতাদের চেয়ে অবিবাহিতাদের মধ্যে স্বভাবিজাত লজ্জাটা প্রবল হয়। এজন্য বিবাহিতা নারীদের ফেতনায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা তুলনামূলক বেশি।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা এমনভাবে সাজানো যে, তা উভয়ের মর্যাদা রক্ষা করে এবং সমাজকে নৈতিক সংকট থেকে বাঁচায়। তাই ফ্রি মিক্সিং বা অবাধ মেলামেশা ইসলামে নিরুৎসাহিত—কারণ এটি ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়, অনুভূতির বিচ্যুতি ও পারিবারিক ভাঙনের পথ তৈরি করে।ফ্রি মিক্সিং অবস্থায় নারীদের কাজ পুরোই নাজায়েজ।

অভিভাবকের অনুমতি

সৃষ্টিগত নাজুকতার কারণে নারীর জন্য সবসময় এমন একজন পুরুষের প্রয়োজন, যে হবে নারীর জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রর বিশ্বস্ত রক্ষক। নারী যতদিন বাবার বাড়ি থাকে, ততদিন বাবাই তার সেই নিরাপদ দুর্গ। আবার বিয়ের পরে স্বামীর কাঁধে চলে যায় তার নিরাপত্তার দায়িত্ব এজন্যই ঘরের ভেতরে বা বাইরে নারীর চাকরির ক্ষেত্রে বাবা বা স্বামীর অনুমিত মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্তঅবস্থাগুলো হতে পারে :

১. নারী ঘরের ভেতরে থেকেই উপার্জন করবে আর এই উপার্জন-ব্যস্ততা স্বামীর অধিকার নষ্টের কারণ হবে না।

২. নারী ঘরের ভেতরেই উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা করে নেবে, কিন্তু এই ব্যস্ততা তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলবে এবং স্বামীর অধিকার আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

৩. উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে যেতে নারী বাধ্য হবে।

৪. ন্যুনতম কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উপার্জনের নারী বাইরে যেতে পারবে।

এই অবস্থান গুলো ভিন্ন হবে। প্রথম অবস্থায় কাজে যাওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি দরকার নেই। কারণ, এই অবস্থায় নারী ঘরের বাইরেও যাচ্ছে না এবং স্বামীর হকও নষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। না হলে স্বামীর বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে। এতে স্বামীর হক নষ্ট হবে না।

নারীর ঘরের ভেতরে উপার্জন

নারীর উপার্জনের জন্য চেষ্টা ও শ্রম শরিয়তে জায়েজ আছে। নারী ঘরে বসে উপার্জন করলে স্বামী বা অভিভাবকের জন্য তাকেৰ উপার্জনে বাধা দেওয়ার অনুমতি নেই। যতক্ষণ না তার উপার্জনের কারণে কারো হক নষ্ট হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহ. ২টি বক্তব্য স্পষ্ট হয়।

১. উপার্জনের জন্য নারীর কর্মব্যস্ততা যদি তার স্বামীর অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, কাজের কারণে রাত্রিজাগরণের ফলে নারীর সৌন্দর্য ও কান্তি মান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে স্বামী তার স্ত্রীকে ঘরে বসে উপার্জনেও বাধা দিতে পারবে।

২. স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ দিচ্ছে, কেবল এ কারণে নারীকে ঘরে অবস্থান করে উপার্জনে বাধা দেওয়া যাবে না। কেননা, অনেক সময় নারীর এমন কোনো বস্তুর প্রয়োজন হতে পারে, যা পূরণ করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়। এমন সব প্রয়োজন পূরণ করার জন্য স্ত্রী এ শর্তে উপার্জন করতে করবে যে কাজের জন্য তাকে যেন ঘরের বাইরে যেতে না হয় এবং করর্মব্যস্তার ফলে স্বামী বা পরিবারের অধিকার কোনোভাবে ক্ষুন্ন না হয়।

নারীর ঘরে বাইরে উপার্জন

যেসব নারী অফিস-আদালেত চাকরি করে, তারা সাধারণত তিন ধরনের হয়।
১. ওই সব নারী, যারা নিজেদের এবং পরিবারের সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতার জন্য ঘরের বাইরে গিয়ে চাকরি করে। স্বামীর সাথে পরিবারের আর্থিক ভার বহন করে। অধিকাংশ করর্মজীবী নারী এ প্রকারের হয়।

২. যেসব নারীর উপার্জনের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা নিজের চাহিদা পূরণ করতে বা ক্যারিয়ার গঠন করতে চাকরির জন্য ঘরের বাইরে যায়। ঘরে অবস্থান করাকে তারা নিজেদের ব্যক্তিতৃ ও যোগ্যতার প্রতি অপমানজনক মনে করে।

৩. ওই সকল নারী, যারা সমাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করে। যেমন : মহিলা ডাক্তার। তারা সমাজে নিজের কর্তব্য পালন এবং নারীদের। পরিমণ্ডলে অধ্যাপনা, চিকিৎসা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন পূরণ করে।
ঘরের বাইরে গিয়ে নারীর কাজ করার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর ওপর ওয়াজিব, এজন্য সাধারণভাবে স্ত্রী উপার্জনের দায়িতু থেকে স্বাধীন। তবে কোনো নারীর জন্য উপার্জন অপরিহার্য হয়ে উঠলে বা নারীর কোনো কাজের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন পূরণ হলে শরিয়তের বিধিনিষেধ মেনে তার জন্য রের বাইরে গিয়ে কাজ করার অনুমতি আছে।

আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثمَ عَلَيه

"অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই।"৩৩

তাই বলা যায় শরিয়তে নারীদের উপার্জন করতে পারবে।

পরিশ্রম ইবাদত হিসেবে

ইসলাম নারীর প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত পরিশ্রমকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। শুধু উপাসনালয়ে নয়, বরং জীবনের প্রতিটি সৎ কাজই ইবাদত—যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈতিকতার ভিত্তিতে করা হয়। নারীর ঘর-সংসার দেখা, সন্তান লালন-পালন করা, শিক্ষালাভ করা, কর্মজীবনে অবদান রাখা—এসবই ইবাদত, যখন তার উদ্দেশ্য হয় দায়িত্ব পালন, উপকার করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর পরিশ্রমের মূল্য :-

১.স্ত্রী হিসেবে পরিবারকে সামলানো—ইবাদত।
২.মা হিসেবে সন্তানকে ভালো মানুষ গড়া—ইবাদত
৩.পরিবারকে দুটো হালাল রুজির জন্য কাজ করা—ইবাদত
৪.শিক্ষা অর্জন করে সমাজকে উপকার করা—ইবাদত
৫.অসুস্থ স্বামী-বাবা-মা বা পরিবারের সেবা করা—ইবাদত

প্রত্যেক নৈতিক কাজ, ত্যাগ, শ্রম ও দায়িত্ব—আল্লাহর কাছে মূল্যবান।
মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন :-
"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম।"৩৪

নারীর শ্রম কখনো অবহেলা বা ছোটো করার বিষয় নয়। তিনি যখন ভালো উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করেন, তখন তা কেবল দায়িত্ব নয়— তা হয় সওয়াবের দরজা, ইবাদতের উপহার, এবং সম্মানের প্রতীক।

ইসলামে হালাল উপায়ে পরিশ্রম করা এক ধরনের ইবাদত। নারী যদি নিজের ও পরিবারের কল্যাণে পরিশ্রম করে, তাহলে তাও আল্লাহর নিকট সওয়াবের কাজ বলে গণ্য হয়।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন —

"নিজের হাতে উপার্জিত রোজগারের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ খায়নি।"৩৫

কর্মজীবনে নৈতিকতার গুরুত্ব

ইসলাম নারীর কর্মজীবনে শালীনতা, সততা ও ন্যায্যতা বজায় রাখতে উৎসাহ দিয়েছে। কর্মজীবনে নারীর নৈতিকতার গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর ও মূল্যবান। নৈতিকতা শুধু ব্যক্তিগত গুণই নয়, বরং একটি পবিত্র আমানত—যা একজন নারী তার কর্মক্ষেত্র, সমাজ এবং পরিবারের কাছে বহন করে নিয়ে যায়। নারীর নৈতিকতা তাকে সত্যবাদিতা, দায়িত্বশীলতা এবং ন্যায়পরায়ণতার পথে পরিচালিত করে। কর্মক্ষেত্রে সততা শুধু একজনের ব্যক্তিত্বকে উন্নত করে না, বরং প্রতিষ্ঠান ও সমাজেও আস্থা তৈরি করে।

নৈতিকতা নারীর আচরণ, কথা এবং পোশাকে শালীনতা বজায় রাখতে শেখায়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নিজেকে মর্যাদাবান রাখা একজন নারীর শক্তি ও সম্মানের প্রতীক। নৈতিকতা নারীর আত্মসম্মান রক্ষা করে। সঠিক নীতি অনুসরণ করলে নারী নিজের নিরাপত্তা, সীমা এবং মর্যাদা বজায় রাখতে পারে, এবং অন্যদেরও আচরণে সতর্ক করে।

কর্মক্ষেত্রে নৈতিক নারীরা অন্য নারীদের প্রেরণা দেয় এবং একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ তৈরি করে। পাশাপাশি তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে। কর্মজীবনে নৈতিকতা নারীর সম্মান ও শক্তি।
এটি তার সফলতা, মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং নেতৃত্বের মূলভিত্তি।নৈতিক নারী মানেই শক্তিশালী নারী — যিনি মূল্যবোধ দিয়ে জয় করেন, শুধু পদ দিয়ে নয়।

হালাল রোজগার কেবল অর্থের নয়, বরং আত্মসম্মান ও ঈমানের প্রতিফলন।
প্রতারণা, সুদ, ঘুষ বা অনৈতিক উপায়ে উপার্জন ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ সুবহান ওয় তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ হারাম করেছেন সুদকে এবং হালাল করেছেন ব্যবসাকে।"৩৬

নারীর অবদান

আজকের যুগে নারী চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা, প্রযুক্তি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই অংশ নিচ্ছেন সম্মানের সাথে। তাদের হালাল রোজগার শুধু পরিবার নয়,
সমাজ ও রাষ্ট্রেরও উন্নতির ভিত্তি তৈরি করছে।ইসলাম নারীকে দিয়েছে কাজ করার অধিকার, উপার্জনের স্বাধীনতা ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান। তার হালাল রোজগারই জীবনের সেই "রঙিন পালক",যা তাকে আত্মনির্ভর, সম্মানিত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে আলোকিত করে তোলে।

ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন, মর্যাদাবান ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি আর কারো সম্পদ নন— বরং নিজেই সম্পদের মালিক, সমাজ ও পরিবারের শক্তির উৎস। ইসলাম বললো— নারী কোনো বোঝা নয়, বরং তিনি পরিবারের সম্মান, সমাজের অংশীদার এবং অর্থনীতির সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। আজও যেসব সমাজ নিজেকে আধুনিক বলে দাবি করে, তাদের অনেকেই নারীর সম্পদ ও আর্থিক স্বাধীনতা পূর্ণভাবে মানতে ব্যর্থ।

কিন্তু ইসলাম ১৪০০ বছর আগেই নারীর এই অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছে— সম্মান, ন্যায় ও স্বাধীনতা শুধু পুরুষের নয়, নারীরও সমান মর্যাদা।
তার উপার্জন, সম্পদ ও উত্তরাধিকার আজও প্রমাণ করে— ইসলাম নারীকে দিয়েছে সত্যিকার অর্থেই "অধিকার ও স্বাধীনতা।"

মোহরানার মহিমা : বিবাহে সম্মান ও অধিকার

ইসলাম নারীকে যে সম্মান দিয়েছে, মোহরানা তার অন্যতম নিদর্শন। এটি কোনো "দাম" নয়, বরং নারীকে সম্মানিত করার প্রতীক। ইসলামে বিবাহ শুধু একটি সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি এক পবিত্র বন্ধন—যার ভিত্তি পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বন্ধনে মোহরানা (মহর) নারীর জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও সম্মানের প্রতীক। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে।
মোহরানা নারীকে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল না রেখে স্বামীর পক্ষ থেকে একটি আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করে।

প্রাচীন আরবে যৌতুক দেয়ার প্রথা চালু ছিল, নবুয়াত প্রাপ্তির পর মুহাম্মদ (ﷺ) এই মোহর আদায় করা স্বামীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং বিয়েতে স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারণ এবং তাতে নারীর পূর্ণ মালিকানা প্রদান ইসলামি বিধানের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

দেনমোহর বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত এক গুরুত্বপূর্ণ হক বা অধিকার। দেনমোহর নারীদের অস্তিত্বের বিনিময় নয়। বরং মানবতা রক্ষার্থে দেনমোহর আদায় করা হয়ে থাকে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দেনমোহরের কথা উল্লেখ রয়েছে। দেনমোহর বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন—

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহরানা আনন্দের সাথে প্রদান করো।"৩৭

এই আয়াতে "নিহলাহ" শব্দের অর্থ হলো — স্বতঃস্ফূর্তভাবে, খুশিমনে ও আন্তরিকতার সাথে। অর্থাৎ, মোহরানা কখনো দান বা অনুগ্রহ নয়, বরং এটি নারীর অবিচ্ছেদ্য অধিকার।

অন্য আরেকটি আয়াতে আছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

"হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদের আপনি মোহরানা প্রদান করেন।"৩৮

দেনমোহরের পরিমাণ

দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। যদি কেউ তার চেয়ে কম দেনমোহর নির্ধারন করে তাহলে তা ধর্তব্য হবে না; বরং দশ দেরহাম ওয়াজিব হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: "দশ দেরহামের চেয়ে কম দেনমোহর নেই।"৩৯

মোহরানার উদ্দেশ্য

মোহরানা নারীর আর্থিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রতীক। এটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সম্মানজনক ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। ইসলামে পুরুষের ওপর এটি একটি দায়িত্ব, যাতে নারী নিজেকে নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন বোধ করে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"যে ব্যক্তি মোহরানা আদায় করার নিয়ত না করে বিবাহ করে, সে একপ্রকার প্রতারণা করে।"৪০

মোহরানা দুইভাবে নির্ধারণ করা যায় —
1. তাৎক্ষণিক (মুহাজ্জাল): বিয়ের সময়ই প্রদান করা হয়।
2. বিলম্বিত (মু'আজ্জাল): পরবর্তী সময়ে বা প্রয়োজনে প্রদান করা হয়।

তবে ইসলাম পুরুষকে উৎসাহ দেয় যেন সে মোহরানা দেরি না করে, কারণ এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা।

মোহরানা নারীর নিজস্ব সম্পদ

ইসলাম মোহরানাকে নারী নিজের একক সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেছে।
কেউ—স্বামী, বাবা বা পরিবার—এটি কেড়ে নিতে বা ব্যবহার করতে পারে না, যতক্ষণ না নারী নিজে স্বেচ্ছায় অনুমতি দেন।
কুরআনে বলা হয়েছে—

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“আর যদি তারা খুশি মনে মোহরানার কোনো অংশ তোমাদের জন্য ছেড়ে দেয়, তবে তা আনন্দের সঙ্গে ভোগ করো।”৪১

মোহরানা শুধু একজন নারীর অধিকার নয়, বরং এটি সমাজে ন্যায়, মর্যাদা ও পারস্পরিক সম্মানের প্রতীক। এটি নারীকে বিবাহে সম্মানিত অবস্থানে স্থাপন করে এবং তার প্রতি স্বামীর দায়িত্বশীল মনোভাবের প্রতিফলন ঘটায়।

মোহরানা নিয়ে একটি ঘটনা :

মুহাম্মদ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগেও কখনো কখনো বড় অংকের মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : মুহাম্মদ (ﷺ) সম্মানিতা স্ত্রী উম্মে হাবিবা রা.-এর মোহর ছিল চার হাজার দিরহাম, যা নবীজির পক্ষ থেকে হাবাশার বাদশাহ নাজাশী নির্ধারণ করে তিনি নিজেই সেটা আদায় করে দিয়েছি েলেন।
মোহরের পরিমাণ সংক্রান্ত এই আলোচনায় একটি শিক্ষণীয় ও মজার ঘটনা আছে। তখনকার সময় হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকাল। মানুষ গর্ব করার জন্য বেশি পরিমাণে মোহর নির্ধারণ করা শুরু করল। উমর রা., বিষয়টা লক্ষ করে মোহরের পরিমাণ সর্বোচ্চ চারশ দিরহাম নির্দিষ্ট করে দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করলেন। যাতে এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি যখন খুতবায় তার এ ইচ্ছা কথা ব্যক্ত করলেন, এক কুরাইশি নারী প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, আপনি কীভাবে মোহরের সর্বোচ পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন,
যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই বলে দিয়েছেন:

وَإِن أَرَدتُمُ استِبدالَ زَوجٍ مَكانَ زَوجٍ وَآتَيتُم إِحداهُنَّ قِنطارًا فَلا تَأخُذوا مِنهُ شَيئًا

"তাদের কাউকে যদি তোমরা কিনতার (প্রচুর সম্পদ) দিয়ে থাকো, তাহলে সেখান থেকে কোনো কিছু ফিরিয়ে নিয়ো না"৪২

উমর রা. সবসময় সত্যকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতেন। মহিলার কথা শুনে তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দিন! সকল মানুষ উমরের চেয়ে জ্ঞানসম্পন্ন।' তারপর সবাইকে লক্ষ করে বললেন, 'আমি আপনাদেরকে চারশ দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে কেউ চাইলে নিজের সম্পতি থেকে এরচেয়ে বেশি মোহর দিতে পারবে। ৪৩

আল্লাহ তাআলা যখন সাহাবায়ে কেরামকে আর্থিক সমৃদ্ধি দান করলেন, তাদের দরিদ্রতা দূর হলো, তখন তারা বড় অংকের মোহরও নির্ধারণ করেছেন। স্বয়ং উমর রা.-এর ব্যাপারে উল্লেখ আছে, তিনি আলী রা.-এর কন্যা উম্মে কুলসুম রা.-কে বিবাহের সময় মোহর নির্ধারণ করেছিলেন চল্লিশ হাজার দিরহাম।৪৪
যথাসম্ভব এটা নবী-পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদরর্শন হিসেবে ছিল।

আবদুল্লাহ ইবেনে উমর রা.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি তার কন্যাদের মোহর এক হাজার দিনার নির্ধারণ করতেন। কোথাও পনেরোশ দিনারের কথাও উল্লেখ আছে।

হয়রত আনাস বিন মালেক রা. এক মহিলাকে বিয়ে করার সময় মোহর নির্ধারণ করেছিলেন বিশ হাজার দিরহাম। সুতরাং বেশি পরিমাণে মোহর নির্ধারণ যদি বড়ত্ব প্রকাশের জন্য না হয়, বরং স্ত্রীকে বড় অংকের মোহর দেওয়ার ইচ্ছা থাকে এবং স্বামীর এই সামর্থ্য থাকে, তাহেল বড় অংকের মোহর নির্ধারণ কোনো সমস্যা নেই।

তবে সাধারণভাবে মোহরের পরিমাণ এত অল্প হওয়া যাবে না যে, তার কোনা গুরুতৃই অবশিষ্ট না থাকে, আবার এত বেশি নির্ধারণ করাৰউচিত নয়ৰ যা স্বামীর পক্ষে আদায় করা কঠিন হবে।

মুহাম্মদ (ﷺ) সম্মানিতা স্ত্রীদের মোহর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঁচশ দিরহাম ছিল।৪৫

গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী হযরত ফাতেমা রা.-এর মোহরও ছিল পাঁচশ দিরহাম।৪৬

ইসলাম নারীর প্রতিটি অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে — মোহরানা তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।
এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামী সমাজে নারী কেবল একটি নির্ভরশীল সত্তা নয়; বরং সে একজন স্বাধীন, মর্যাদাসম্পন্ন ও অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

মোহরও অন্যান্য ঋণের মতো একটি ঋণ। এজন্য নিয়ম হলো, মোহর বিবাহের সময়ই পরিশোধ করে দেওয়া। সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগ এবং তাদের পরবর্তী কয়েক যুগে বিয়ের সময় মোহর পরিশোধ করে দেওয়াই সাধারণ রীতি ছিল। যদি বিয়ের সময় সম্পূর্ণ মোহর আদায় করা সম্ভব না হতো, তাহলে অল্প পরিমাণে হলেও দিয়ে দিতেন। এই নিয়ম ইসলামি আরবসমাজে এত শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, ফকিহরা লিখেছেন, আরবসমাজে কোনো নারী যদি দাবি করে, স্বামীর সাথে তার বাসর হয়ে গেছে, অথচ স্বামী তার মোহরের সামান্য অংশও আদায় করেনি, তাহলে এই নারীর কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এটা বাস্তবতার বিপরীত। অনেক সময় দেখা যায় বিয়েতে কেবল প্রচলন হিসেবে মোহর নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু তা আদায়ের কোনো ইচ্ছাই থাকে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :
কেউ বিবাহের সময় মোহর নির্ধারণ করল, কিন্তু তার মনে মোহর আদায়ের কোনো ইচ্ছাই নেই, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার কাছে ব্যভিচারী হিসেবে পরিগণিত হবে।৪৭

কেউ যদি কোনো মহিলাকে কম বা বেশি মোহর নির্ধারণ করে বিয়ে করে, কিন্তু এই মোহর আদায়ের ইচ্ছা তার না থাকে, তাহলে সে ধোঁকাবাজি করল। ওই ব্যক্তি যদি মোহর আদায় না করে মারা যায়, তাহলে কেয়ামতের দিন ব্যভিচারী হিসেবে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবে।৪৮

কিছু কাপুরুষ স্ত্রীকে জ্বালাতন করে, যাতে সে নিজ থেকেই মোহর মাফ করে দিতে রাজি হয়ে যায় এটা খুবই অনুচিত কাজ।স্ত্রীকে মোহর মাফ করে দেওয়ার জন্য মানসিক চাপ দিতে থাকে। দুঃখে ও শোকে জর্জরিত স্ত্রী তখন মাফ করার জন্য রাজি না থাকলেও লজ্জায় মুখে অস্বীকার করে না। এটা খুবই অনুচিত ও অনৈতিক একটি কাজ। শরিয়তে মূলনীতি হলো, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে সর্বপ্রথম তার সমস্ত ঋণ পরিশো করা হবে, তারপর মিরাসের বণ্টন হবে। অন্যান্য ঋণ যেমন পরিণোধ কর ওয়াজিব এবং পরিশোধ না করলে জবাবদিহিতা করতে হবে, তেমনি মোহরও একটি ঋণ এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। তাই মোহর মাফ করানোর সুযোগ নেই, বরং মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রথমে

অন্যান্য পাওনাদারের মতো স্ত্রীর মোহর আদায় করা হবে, তারপর অবশিষ্ট সম্পদ আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

এতে বুঝা যায় -

■ মোহর হলো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ঋণ।

■ তা বিবাহের সময় পরিশোধ করা উত্তম।

■ ইচ্ছাকৃতভাবে না দেওয়া প্রতারণা ও গুরুতর গুনাহ।

■ স্ত্রীকে চাপ দিয়ে মোহর মাফ করানো নিষিদ্ধ।

■ মৃত্যুর পরও মোহর স্ত্রীর পাওনা হিসেবে আদায় করতে হবে, তারপর সম্পত্তি ভাগ হবে।

উত্তরাধিকারের সুবিচার : ন্যায্য বণ্টনের আলো

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতার শিক্ষা দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নারীর উত্তরাধিকারের অধিকার। ইসলাম আগমনের আগে জাহিলিয়াত যুগে নারী উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু ইসলাম সেই অন্যায় প্রথার অবসান ঘটিয়ে নারীর প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।ইসলাম আগমনের আগে আরব সমাজে নারী ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অধিকারবঞ্চিত।নারীরা উত্তরাধিকার পেত না; বরং তাদেরকেই সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

ইসলাম আগমনের পূর্বে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর কোনো অধিকার আছে বলে মনেই করা হতো না। আরবরা মনে করত, যে ব্যক্তি গোত্রের প্রতিরক্ষা করতে পারে এবং যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে, কেবল সে-ই মিরাসের হকদার হবে।

ইহুদি ধর্মে পুরো উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রথম পুত্রের হক মনে করা হতো। হিন্দ ধর্মেও নারীরা মিরাসের অংশ পেত না। এমনকি ইউরোপেও উনিশ শতক পর্যন্ মেয়েরা মিরাস থেকে বঞ্চিত হতো।

ইসলাম যেখানে পুরুষ আত্মীয়দেরকে উত্তরাধিকারে অংশীদার বানিয়েছে, সেখানে তাদের সমপর্যায়ের নারীদেরকেও মিরাসের হকদার আখ্যা দিয়েছে। পিতার মতো মাতাকে, ছেলের সাথে মেয়েকে, ভাইয়ের সাথে বোনকে, স্বামীর মতো স্ত্রীকে। আজ পুরো পৃথিবীতে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর যে অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে, এটা মূলত ইসলামেরই উপহার।

পিতা মারা গেলে ছেলেরা মায়ের বা সৎমায়ের ওপরও অধিকার দাবি করত।
নারীর কোনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা সম্পদের মালিকানা ছিল না।

কিন্তু ইসলাম এসে এই অমানবিক প্রথার অবসান ঘটায় এবং নারীর অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ نَصيبًا مَفروضًا

“পুরুষদের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে, অল্প বা অধিক নির্দিষ্ট পরিমাণ।”৪৯

এ আয়াতে কারিমার মাধ্যমে নারীদেরকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানানো হয়েছে। আর তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ লাভ করার পর নিজেরা মালিক হওয়ার অধিকার লাভ করেছেন। অথচ ইসলাম আগমনের পূর্বে তারা নিজেরাই অন্যের মালিকানাধীন সম্পত্তির মতো ছিলেন।

মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘অল্প বা অধিক এমনকি পুরুষদের জন্য পুরুষদের ব্যবহার্য বস্তুও নির্ধারণ করে দেননি; বরং পুরুষের পরিত্যক্ত জামা-কাপড়, তরবারি, পাগড়ি ও লাঠিতেও নারীদের অধিকার সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে যেসব আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যারা কোনে অবস্থায় মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে না, তারা মোট ছয়জন| তাদের মধ্য তিনজন পুরুষ : পিতা,

পুত্র, স্বামী। আর তিনজন নারী : মাতা, কন্যা, স্ত্রী। এছাড়াও বিশেষ গুরুতু পায় আসহাবুল ফারায়েয়, অর্থাৎ এমন আত্মীয়, যাদের অংশ কুরআনে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে| আসহাবুল ফারায়েযের মধ্যে পুরুযের তুলনায় নারী আত্মীয়ের সংখ্যাই বেশি। কারণ, পুরুষ ছয় অবস্থায় আসহাবুল ফারায়েযের অন্তর্ভুক্ত হয়, আর নারী সতেরো অবস্থায় আসহাবুল ফারায়েয হিসেবে মিরাসের হকদার হয়।

উত্তরাধিকার সম্পদে কোন কোন নারী অংশ পাবে এবং তাদের অংশের পরিমাণ কতটুকু হবে, তা এখানে উল্লেখ করা হলো :

ক. দুই তৃতীয়াংশ

১. দুই অথবা দুইয়ের অধিক মেয়ে

২. দুই অথবা দুইয়ের অধিক পৌত্রী

৩. দুই অথবা দুইয়ের অধিক সহোদরা

৪. দুই অথবা দুইয়ের অধিক বৈমাত্রেয় বোন

খ. অর্ধেক

১. এক মেয়ে ২. এক পৌত্রী ৩. এক সহোদরা ৪. এক বৈমাত্রেয় বোন

গ. এক তৃতীয়াংশ

১. মা ২. বৈপিত্রেয় বোন

ঘ় এক ষষ্ঠাংশ

১. মা ২. দাদি ৩. পৌত্রী ৪. বৈমাত্রেয় বোন ৫. বৈপিত্রেয় বোন

ঙ. এক চতুর্থাংশ

১. স্ত্রী

চ. এক অষ্টমাংশ

১. স্ত্রী

এটা স্পষ্ট যে, নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলা দুই তৃতীয়াংশ, তারপর অর্ধেক। এই 'দুইতৃতীয়াংশে' কোনো পুরুষ অংশীদার হয় না। আর 'অর্ধেকে' শুধুমাত্র স্বামী হকদার হতে পারে, তাও যখন মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকবে নাহ।

ইসলাম নারীর মর্যাদা পুনঃস্থাপন

ইসলামই প্রথম নারীকে উত্তরাধিকারের অধিকার দিয়েছে—
স্ত্রী স্বামীর সম্পদে অংশ পায়।
মেয়ে পিতার সম্পদে অংশ পায়।
মা সন্তানদের সম্পদে অংশ পায়।
বোন ভাইয়ের সম্পদে অংশ পায়। যেমন :-

■ স্ত্রী স্বামীর সম্পদের ১/৪ বা ১/৮ অংশ (সন্তান থাকলে ১/৮, না থাকলে ১/৪)।

■ মা সন্তানের সম্পদের ১/৬ অংশ (যদি সন্তান থাকে)।

■ কন্যা একমাত্র হলে অর্ধেক, একাধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশ ভাগে ভাগ করে।

■ বোন ভাই না থাকলে নির্দিষ্ট অংশ পায়।

এসব অংশ কুরআনের নির্ধারিত বিধান, যা কোনো মানুষের ইচ্ছা বা সামাজিক প্রথা দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

ইসলামে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

মানব ইতিহাসে একসময় নারী ছিল সম্পত্তির অংশ— সে নিজে সম্পত্তির অধিকারী নয়; বরং তাকেই উত্তরাধিকারসূত্রে “ভাগ” করা হতো।

ইসলাম সে অমানবিক যুগ ভেঙে প্রথম ঘোষণা দেয়— নারী মানুষ, সম্মানিত সত্তা, এবং সম্পদের পূর্ণ অধিকারী।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন —

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"পুরুষের জন্য রয়েছে তার অর্জনের প্রতিদান, এবং নারীর জন্যও রয়েছে তার অর্জনের প্রতিদান।"৫০

এ আয়াত নারীর সম্পদ ও উত্তরাধিকারে অধিকারকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম নারীদের মা, কন্যা, বোন ও স্ত্রী—এই চার সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করেছে।

নারীর প্রাপ্য অংশ ন্যায্যতার প্রতীক
অনেকে প্রশ্ন তোলে—কেন পুরুষের অংশ নারীর চেয়ে বেশি?
এর উত্তরে ইসলাম বলে, পুরুষের ওপর পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু নারীর অংশ তার ব্যক্তিগত সম্পদ, যা সে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে।
অতএব, নারীর অংশ কম হলেও তা ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন।

অন্যায় বঞ্চনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

আইন থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে নারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এটি সম্পূর্ণ অন্যায় এবং ইসলাম বিরোধী কাজ। বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-**১৯৬১** অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন হলেও, অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এবং সামাজিক কুসংস্কারের কারণে নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। অনেক পরিবারে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, নারী সম্পত্তি পেলে সংসারে অশান্তি হয় বা মেয়েকে কিছু দিলে তাকে অন্য পরিবারে সম্পদ দিয়ে পাঠানো হচ্ছে—এমন চিন্তা ইসলাম সমর্থন করে না বরং এটি অমানবিক, বৈষম্যমূলক ও গুনাহের কাজ।

যারা নারীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, নারীর অধিকার বা অংশ লুকিয়ে রাখবে বা তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে,কুরআন তাদের কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছে —

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"যারা অন্যায়ভাবে এতিম বা উত্তরাধিকারের সম্পদ খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভরে।"৫১

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তির সামান্য অংশও অবৈধভাবে গ্রহণ করে, কিয়ামতের দিনে তা তার গলায় আগুনের শৃঙ্খল হিসেবে পরানো হবে।"৫২

নারীর অধিকার হরণ করা শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, গুরুতর ধর্মীয় অপরাধ।

ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার নির্ধারণ করেছে ন্যায়, দায়িত্ব ও মানবিকতার ভিত্তিতে। এটি কোনো বৈষম্য নয়, বরং পরিবার ও সমাজে আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার সুবিচার।ইসলাম পুরুষ ও নারীর অংশ নির্ধারণ করেছে তাদের দায়িত্ব ও আর্থিক বোঝার ভিত্তিতে, বৈষম্যের কারণে নয়। পুরুষ পরিবারে ব্যয়ভার বহন করে, কিন্তু নারীর অংশ একান্তই তার নিজস্ব সম্পদ—সে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে।

নারীর উত্তরাধিকার ইসলামি ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যা প্রমাণ করে, ইসলাম নারীর সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বাধিক অগ্রগামী ধর্ম। অতএব নারীর সম্পত্তি বঞ্চনা শুধু আইনি অপরাধ নয়; এটি ধর্মীয় অপরাধ, নৈতিকতা বিরোধী, এবং সামাজিক অবিচার।

নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা শুধু তার অধিকার প্রদানের নাম নয়; বরং এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবসম্মান রক্ষা এবং সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যখন নারী আর্থিকভাবে স্বাধীন হয়, তখন পরিবার ও সমাজ আরও শক্তিশালী হয়।
ইসলাম নারীর উত্তরাধিকারে সম্মান, ন্যায় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। এটি শুধু সম্পদের বণ্টন নয়, বরং সমাজে সমতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সদাচারের সুবাস : পারিবারিক জীবনে নারীর মর্যাদা

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়, দয়া ও সদাচারের শিক্ষা দিয়েছে। পারিবারিক জীবনে নারী সেই শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম নারীর প্রতি এমন সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

ইসলামে পরিবারে নারীর মর্যাদা অপরিসীম। তিনি শুধু পরিবারের সদস্য নন, বরং পরিবারের শান্তি, ভালোবাসা, শিক্ষা, নৈতিকতা ও করুণা-র কেন্দ্র। মা হিসেবে তার পায়ের নিচে জান্নাত রাখা হয়েছে, যা তার মর্যাদার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। স্ত্রী হিসেবে তাকে সম্মান, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব, আর তার প্রতি উত্তম আচরণ করা ঈমানের নিদর্শন। কন্যা হিসেবে তাকে রহমতের উপহার বলা হয়েছে এবং ভালোভাবে লালন-পালনকারী পিতামাতার জন্য জান্নাতের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। বোন হিসেবে সে স্নেহ, যত্ন ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য। ইসলামে নারী পরিবারে আর্থিক নিরাপত্তা ও সম্মানের অধিকারী—তার নিজস্ব সম্পদে পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর।

ইসলাম আগমনের আগে নারীর অবস্থা

ইসলাম আগমনের আগে সমাজে নারী ছিল অবহেলিত ও নিগৃহীত।
তাদেরকে সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো, কোনো মতামতের অধিকার ছিল না।
কিন্তু ইসলাম এসে এই অমানবিক আচরণের অবসান ঘটিয়ে নারীর প্রতি মমতা, ন্যায় ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে বারবার বলা হয়েছে নারীর প্রতি সদাচার ও সম্মানজনক আচরণ করতে। আল্লাহ তাআলা বলেন —

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো।"৫৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।"৫৪

এই নির্দেশনাগুলো প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে নির্দেশ দেয়। নারী – পরিবার ও সমাজের মেরুদণ্ড

নারী একজন মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন হিসেবে সমাজের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো :-

মা হিসেবে তিনি সন্তানের প্রথম বিদ্যালয়

একজন মা শুধু সন্তানের জন্মদাত্রী নন, তিনি তার প্রথম শিক্ষক, প্রথম আদর্শ, এবং প্রথম বিদ্যালয়। যখন একটি শিশু জন্ম নেয়, সে কিছুই জানে না — না কথা বলা, না ভালো-মন্দের পার্থক্য।এই পৃথিবীতে প্রথম যে মানুষটি তাকে কথা বলা, হাঁটা, খাওয়া, হাসা, আদব, আচরণ, দয়া ও ঈমান শিখায় —সে হচ্ছে মা।

ইসলাম মা'কে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —
"তোমার মায়ের পায়ের নিচেই জান্নাত।"৫৫

এর অর্থ হলো, মা শুধু সন্তানকে মানুষ বানান না, বরং তার শিক্ষার, চরিত্রের ও ঈমানের ভিত্তি গড়ে দেন।

একজন মায়ের আচরণ, তার কথাবার্তা, নামাজ-রোজা, দয়া, ধৈর্য —
সবকিছুই সন্তানের মনে গভীর ছাপ ফেলে। যে মা আল্লাহভীরু, সৎ ও সদয় — তার সন্তানও সাধারণত সেই পথেই বড় হয়।
তাই বলা হয়,

"একজন ভালো মা মানেই এক শিক্ষিত জাতি।"

মা কোনো সাধারণ মানুষ নন —তিনি পরিবারের হৃদয়, সন্তানের পথপ্রদর্শক,
এবং সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতা।

স্ত্রী হিসেবে তিনি স্বামীর প্রশান্তি ও জীবনের সঙ্গী

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন —

وَمِن آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا لِتَسكُنوا إِلَيها وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحمَةً إِنَّ في ذٰلِكَ لَآياتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرونَ

"আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো— তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন,যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও; এবং তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন।"৫৬

এই আয়াতেই বোঝা যায়, স্ত্রী শুধু জীবনসঙ্গী নন, বরং স্বামীর মানসিক শান্তি, ভালোবাসা ও সান্ত্বনার উৎস।

স্বামীর জীবনসঙ্গী ও মানসিক সান্ত্বনা। স্ত্রী স্বামীকে মানসিক শান্তি, প্রেরণা ও সাহচর্য দেয়। স্বামী জীবনের বাইরে কাজের চাপ ও দুঃখ ভোগ করে। ঘরে ফিরে স্ত্রী তাকে আবেগীয় সান্ত্বনা ও মনোরম পরিবেশ প্রদান করে। ঘরকে একটি ভালোবাসা ও প্রশান্তির আশ্রয়ে পরিণত করে।

তিনি স্বামীকে সৎ পরামর্শ দেন। পরিবারকে সমতা ও সৌহার্দ্যে পরিচালনা করেন। সংসারে সুখ ও শান্তি স্থাপন করেন। স্ত্রীকে সম্মান ও ভালোবাসা দান করা একজন মানুষের জীবনের সর্বোত্তম আচরণ। স্ত্রী পরিবারের মৌলিক শান্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক।তার প্রীতি, ধৈর্য ও ত্যাগ স্বামীকে নৈতিক ও আত্মিক দিক দিয়ে সমর্থন দেয়। শিশুর বিকাশেও তার উপস্থিতি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

মা, স্ত্রী ও পরিবারের মূল ভিত্তি হিসেবে স্ত্রী থাকলে সংসার হয়ে ওঠে নিরাপদ ও সুসংহত। স্ত্রী কেবল জীবনসঙ্গী নয়, বরং মানসিক প্রশান্তির উৎস, পরিবারের মেরুদণ্ড। তার ভালোবাসা, ত্যাগ ও সহমর্মিতা স্বামী ও পরিবারের জীবনকে সমৃদ্ধ ও শান্তিময় করে। ইসলাম তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে, কারণ তার ভূমিকা একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি।

স্ত্রী ও স্বামী — দুজনেই একে অপরের পরিপূরক।তারা একে অপরের আনন্দ, দুঃখ, পরিশ্রম ও দায়িত্ব ভাগ করে নেয়।স্ত্রী স্বামীর পাশে থেকে তাকে সাহস, সান্ত্বনা ও প্রেরণা দেন।তিনি গৃহকে পরিণত করেন একটি ভালোবাসার আশ্রয়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করে।"৫৭

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীর মর্যাদা কত উচ্চ — তিনি কেবল গৃহিণী নন, বরং জীবনের সাথী,যিনি সুখ-দুঃখে পাশে থাকেন এবং সংসারকে স্বর্গে পরিণত করেন।

স্ত্রী আল্লাহর এক অনন্য নিয়ামত।তিনি ঘরের আলো, ভালোবাসার প্রতীক এবং স্বামীর অন্তরের প্রশান্তি।একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও ঈমানদার পরিবার গঠনের পেছনে স্ত্রীর ভালোবাসা, ধৈর্য ও ত্যাগই সবচেয়ে বড় ভিত্তি।

কন্যা হিসেবে তিনি পরিবারের করুণা ও আশীর্বাদ

কন্যা — পরিবারের আনন্দ ও ভালোবাসার প্রতীক। কন্যা পরিবারে শুধু সন্তান নয়, ভালোবাসা ও মমতার আধার। তার হাসি, সতর্কতা ও কোমল আচরণ ঘরকে সুখময় ও উজ্জ্বল করে। পরিবারের বড়দের প্রতি সে শ্রদ্ধা ও আদর্শ আচরণ শেখায়। ছোট ভাই বা বোনের প্রতি করুণা ও দয়া প্রদর্শন করে পরিবারের বন্ধন দৃঢ় করে। কন্যা পরিবারে ভালোবাসা, দয়া ও মমতা বয়ে আনে।যা তার উপস্থিতি ঘরকে নরমময় ও শান্তিময় করে তোলে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। কন্যা মা-বাবার প্রতি যত্নশীল, যা পরিবারকে একত্রিত রাখে। ইসলাম কন্যাকে সৌভাগ্য ও রহমতের প্রতীক হিসেবে দেখেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"যে ব্যক্তি কন্যাদের গ্রহণ করে এবং তাদের যত্ন ও ভালোবাসা দেখায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতে পুরস্কৃত করবেন।"৫৮

কন্যা শুধু পরিবারে মানসিক শান্তি আনে না, বরং আল্লাহর বরকত ও করুণাও নিয়ে আসে।যা সমাজে কন্যার উপস্থিতি সদাচার ও নৈতিক শিক্ষা প্রচারের উৎস।

কন্যা পরিবারের নৈতিকতা ও সদাচার প্রতিফলিত করে। পরিবারের ছোট সদস্যদের মধ্যে ভালো শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে প্রভাব ফেলে। বাবা-মার জীবনে তার ভালো আচরণ ও সৎ মন আধ্যাত্মিক প্রশান্তি এনে দেয়।কন্যাকে ভালোবাসা ও যত্ন দিলে পরিবারে মঙ্গল ও শান্তি আসে। কন্যা সন্তানের মধ্যে মমতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। ইসলামে কন্যাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে—তার জন্ম, নামাজ, শিক্ষা ও জীবনে সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলাম কন্যাকে মর্যাদা দিয়ে আশীর্বাদ হিসেবে ঘোষণা করেছে। কন্যাকে অবহেলা বা বঞ্চনা করা হারাম এবং গুনাহ।পরিবারে কন্যাকে সম্মান, শিক্ষা ও ভালোবাসা দেওয়া আল্লাহর নির্দেশ। কন্যা পরিবারের কর্মঠতা, ভালোবাসা, নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শান্তির উৎস। যে পরিবারে কন্যার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষিত থাকে, সেই পরিবারে আল্লাহর রহমত ও বরকত স্থায়ী হয়।

তাই ইসলাম নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। নারীর প্রতি সদাচার শুধু পারিবারিক শান্তিই আনে না, বরং এটি সমাজে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও স্থিতিশীলতা

সৃষ্টি করে। যে পরিবারে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়, সেই পরিবারে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে সম্মান, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের সুবাসে রঙিন করেছে। নারীকে সম্মান করা মানে পারিবারিক জীবনে আল্লাহর নির্দেশকে বাস্তবায়ন করা। কন্যা শুধু পরিবারের সৌন্দর্য বা সম্পদ নয়,তিনি আশীর্বাদ ও করুণাের উৎস।

যে পরিবারে কন্যাকে সম্মান ও ভালোবাসা দেওয়া হয়, সেই পরিবারে আল্লাহর রহমত ও সুখ বর্ষিত হয়। যে পরিবারে নারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষিত থাকে, সেটিই হয় ইসলামী আদর্শ পরিবার — শান্তি, সৌন্দর্য ও সদাচারের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

সমাজের অর্ধেক আকাশ : নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ

নারী মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ — সমাজের অর্ধেক আকাশ।
পুরুষ যেমন সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে, তেমনি নারীও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পরিবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, সমাজসেবা—সব ক্ষেত্রেই নারীর উপস্থিতি সমাজকে আলোকিত করে।

আদর্শ, চরিত্রবান ও সুনাগরিক গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে নারীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব নারীর ওপর বর্তায়, যা একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজ গড়ার ভিত্তি তৈরি করে। নারীরা শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন।

ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর অর্থনৈতিক অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা নিজস্ব সম্পদ ও আয়ের ওপর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন। সমাজ ও দেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইসলামী সমাজ গঠনে অপরিহার্য। ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও অধিকার দিয়েছে, তা প্রতিষ্ঠা করাও নারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর সামগ্রিক ভূমিকা

ইসলামী সমাজ গঠনে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শুধু নারীদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে, পুরুষদেরও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে হবে।
নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

ইসলাম কোনো পক্ষকে দমিয়ে বা অবহেলা করে নয়, বরং সহযোগিতা, পরস্পর সম্মান, ন্যায্যতা ও ভারসাম্যের মাধ্যমে সমাজ চালানোর আদর্শ স্থাপন করেছে। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ভূমিকা সৎভাবে পালন করলে—

- পরিবার হবে শান্তির নীড়
- সমাজ হবে ন্যায়ভিত্তিক
- জাতি হবে সমৃদ্ধ ও আলোকিত

ইসলামে নারী ও পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযাত্রী—যারা একে অপরকে পরিপূর্ণতা দান করে এবং সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই দু'পক্ষই যদি তাদের অধিকার ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তবে প্রতিষ্ঠিত হবে এক দায়িত্বশীল, নৈতিক ও কল্যাণমুখী সমাজব্যবস্থা।

আল্লাহ তাআলা উভয়কে সম্মান, অধিকার ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা নৈতিকতার আলোয় পথচলা করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে। ফলে নারীকে ছোট করা বা পুরুষকে অবহেলা নয়—বরং পারস্পরিক সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ, সৎকাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

যে সমাজে নারীকে মর্যাদা ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়, যেখানে শিক্ষা ও কর্মের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত থাকে, যেখানে পুরুষ নারীর অভিভাবক হয়ে নয় বরং সহচর হয়ে পাশে দাঁড়ায়—সেই সমাজই প্রকৃত ইসলামী সমাজ। নারী তার জ্ঞান, চরিত্র, ধর্মীয় সচেতনতা, পরিবার লালনপালন, এবং সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উম্মাহর ভিত্তি শক্তিশালী করে; আর পুরুষ তার দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, উপার্জন, সুরক্ষা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে সেই কাঠামোকে সুসংহত করে।

সত্যিকার ইসলামী সমাজ তখনই সম্ভব, যখনসম্মান, বিশ্বাস, সহযোগিতা ও ন্যায়—এই চার মূলনীতি নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনে বাস্তবায়িত হবে।

ইসলামে নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ

ইসলাম নারীকে শুধু গৃহে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তার জ্ঞান, মেধা ও যোগ্যতাকে সমাজ উন্নয়নে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করেছে।

নারীরা ইসলামের প্রথম যুগেই শিক্ষিকা, চিকিৎসক, বণিক ও পরামর্শদাতা হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) ছিলেন বহু হাদীসের বর্ণনাকারী ও জ্ঞান বিতরণকারী। ছিলেন শিক্ষিকা এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা।

খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী নারী ও ইসলামের প্রথম সমর্থক।

নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.) যুদ্ধে নবীজির পাশে থেকে রক্ষা করেছেন, সাহসিকতার প্রতীক।

শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা.) ছিলেন একজন শিক্ষিত নারী ও মদিনার বাজার তত্ত্বাবধায়ক (এক প্রকার প্রশাসনিক দায়িত্বে)।

নারী প্রশাসন, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও মানবসেবার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। তিনি সমাজে নৈতিকতা, সততা ও সহমর্মিতার উদাহরণ সৃষ্টি করেন। নারী নেতৃত্ব সমাজে ভারসাম্য আনে, কারণ তিনি চিন্তায় কোমল কিন্তু সিদ্ধান্তে দৃঢ়।

ইসলাম নারীকে শুধু পরিবারেই সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তার বুদ্ধি, জ্ঞান ও সক্ষমতাকে সমাজ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মূল্য দিয়েছে।
নারী নেতৃত্ব মানে ক্ষমতা দখল নয়, বরং দায়িত্ব, ন্যায়বিচার ও সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

"আমি তোমাদের মধ্যে পুরুষ বা নারীর কোনো আমল বৃথা যেতে দেব না।"৫৯

অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী উভয়েই আল্লাহর কাছে সমান মর্যাদার অধিকারী, যদি তারা সৎ কাজ ও নেতৃত্বে অবদান রাখে।

সমাজ গঠনে নারীর অংশগ্রহণ

নারী শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পারে।
একজন শিক্ষিত নারী পুরো পরিবার ও সমাজকে সচেতন ও নৈতিক করে তুলতে পারে।

জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, তাই তাদের ছাড়া কোনো দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাদের যথাযথ অংশগ্রহণ একটি দেশের প্রবৃদ্ধির জন্য জরুরি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা একটি স্মার্ট সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব জরুরি।

তাই বলা হয় —
"একজন শিক্ষিত নারী মানেই একটি শিক্ষিত জাতি।"

আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান মর্যাদায় সৃষ্টি করেছেন।

কুরআনে বলা হয়েছে —

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

"আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।"৬০

অর্থাৎ নারী সমাজের অর্ধেক অংশ, তাই সমাজ গঠনে তার অবদান অবিচ্ছেদ্য।তিনি শুধু সংসারেই নয়, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করেন।নারী সমাজের অর্ধেক আকাশ, যিনি জ্ঞান, নৈতিকতা ও নেতৃত্বের আলোয় সমাজকে আলোকিত করেন।

তার অংশগ্রহণ ছাড়া সমাজ কখনও পূর্ণতা পায় না।

ইসলাম নারীর মর্যাদা, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে সম্মান ও দায়িত্বের আলোকে মূল্যায়ন করেছে।

নারী অধিকারই সভ্যতার সৌন্দর্য

নারী ও পুরুষ — উভয়ে মিলে মানবসভ্যতা গড়ে ওঠে। নারীকে অবমূল্যায়ন করলে সমাজের অর্ধেক অংশ পিছিয়ে পড়ে, ফলে সভ্যতা অসম্পূর্ণ থাকে। একটি সভ্য সমাজের সৌন্দর্য কেবল স্থাপত্য, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিতে নয় — বরং মানুষের পারস্পরিক সম্মান, ন্যায্যতা ও সহানুভূতিতে। নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বসংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রেও অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফূট। যে সমাজ নারীর অধিকার নিশ্চিত করে, সেই সমাজই প্রকৃত অর্থে মানবিক ও সভ্য।

একটি জাতির নৈতিক মান যাচাইয়ের অন্যতম উপায় হলো — সেখানে নারীর মর্যাদা কতটা সংরক্ষিত। যেখানে নারী নিরাপদ, সম্মানিত ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেই সমাজেই প্রকৃত সভ্যতার আলো জ্বলে।একটি সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন, ন্যায় ও সভ্যতার মান নির্ভর করে নারীর নিরাপত্তা ও অধিকারের উপর। নারীর মর্যাদা রক্ষা করা মানে পুরো সমাজের নৈতিকতা ও মানবিকতার মান বজায় রাখা।

সভ্যতার প্রকৃত মাপকাঠি

যে সমাজে নারী নিরাপদ, সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করে, সেই সমাজই প্রকৃত অর্থে আলোকিত ও উন্নত সমাজ।

নারীর নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও মর্যাদা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করে। নারীকে সম্মান দেওয়া মানে মানবতাকে সম্মান দেওয়া।কারণ, নারীই মা হিসেবে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলে, শিক্ষক হিসেবে জ্ঞান বিতরণ করে, আর কর্মজীবী হিসেবে সমাজের অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

নারীর প্রতি অন্যায়, নির্যাতন বা অবমূল্যায়ন কেবল একটি ব্যক্তির ক্ষতি নয় — এটি পুরো সমাজের বিবেকহীনতার প্রতীক। যে সমাজ নারীকে অবদমিত করে, সেই সমাজ কখনো টেকসই অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। ইসলাম নারীর মর্যাদাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"৬১

এই নির্দেশ প্রমাণ করে, নারীকে সম্মান করা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি ধর্মীয় কর্তব্যও।

যে সমাজে নারীকে সুরক্ষা ও মর্যাদা দেওয়া হয়, সেখানে শান্তি, ন্যায় ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীর সম্মান রক্ষা করা মানে সমাজের আত্মাকে রক্ষা করা।

ইসলামে নারীর উচ্চ মর্যাদা

ইসলাম আগমনের আগে বিশ্বের বহু সমাজে নারী ছিল অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত। তাকে সম্পত্তির মতো গণ্য করা হতো, উত্তরাধিকার বা সম্মান তার জন্য কল্পনাতীত ছিল।
কিন্তু ইসলাম নারীকে মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার প্রদান করে মানবসমাজে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

ইসলাম নারীকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছে —
মা, কন্যা, স্ত্রী ও সমাজের সদস্য হিসেবে।
প্রতিটি ভূমিকাতেই তাকে ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। নারীকে মানবজাতির মর্যাদার অংশ হিসেবে গণ্য করেছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন —

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।"৬২

এই আয়াত নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও সম্মানের স্পষ্ট প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রী-লোকদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।"৬৩

এ হাদীস স্পষ্টভাবে দেখায় যে, নারীর প্রতি আচরণই একজন ব্যক্তির চরিত্র ও সমাজের মানদণ্ড নির্ধারণ করে।

ইসলাম নারীকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছে, অবমাননা থেকে মর্যাদায় উন্নীত করেছে। তিনি মা হিসেবে জান্নাতের দ্বার, কন্যা হিসেবে বরকতের উৎস, স্ত্রী হিসেবে প্রশান্তির প্রতীক, আর সমাজে ন্যায় ও মানবতার আলোকবর্তিকা।

নারীর উন্নয়নের অগ্রযাত্রা

নারী সমাজের অর্ধাংশ — তার উন্নয়ন ছাড়া কোনো সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। যে সমাজ নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অধিকার নিশ্চিত করে, সেই সমাজই প্রকৃত অর্থে অগ্রগামী হয়। নারী সমাজের অর্ধাংশ — তার উন্নয়ন ছাড়া সমাজ কখনো পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না। নারী শিক্ষিত, স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হলে, তার প্রভাব পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে।

একজন শিক্ষিত নারী শুধু নিজেকে নয়, তার সন্তানদেরও নৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে গড়ে তোলে। তিনি পরিবারে শিক্ষার বাতিঘর, নৈতিকতার মাপকাঠি এবং সামাজিক সচেতনতার রূপান্তর। নারীর অংশগ্রহণ সমাজের অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তিকে সমৃদ্ধ করে। একজন নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষক বা চিকিৎসক হিসেবে সমাজের অগ্রগতিতে সরাসরি অবদান রাখে।

নারীর উন্নয়ন মানে কেবল পার্থিব অগ্রগতি নয়, সমাজে নৈতিকতা, দয়া ও সদাচারের বিকাশও নিশ্চিত হয়। তিনি পরিবারে ও সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনেন। ইসলাম নারীকে আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের সুযোগ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

“আমি তোমাদের মধ্যে পুরুষ বা নারীর কোনো আমল বৃথা যেতে দেব না।”৬৪

অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান মর্যাদা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং তার সঠিক ব্যবহার সমাজকে আলোকিত ও অগ্রগামী করে।

নারীর ধর্ম ও নৈতিকতার আলোয় উন্নয়ন

নারী সমাজের অর্ধেক অংশ, তাই তার উন্নয়ন ছাড়া সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।
কিন্তু ইসলাম যে উন্নয়নের কথা বলে, তা শুধু বাহ্যিক বা অর্থনৈতিক নয় — বরং আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন।

ধর্ম নারীকে দিয়েছে মর্যাদা ও দিকনির্দেশনা।

ইসলাম নারীকে শিক্ষা, অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তার অধিকার দিয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ নারীকে শালীনতা, ন্যায়বিচার ও আত্মসম্মানের পথে পরিচালিত করে। ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম, নারীকে এমন মর্যাদা দিয়েছে যা মানব ইতিহাসে অতুলনীয়। ইসলামের আগমনের আগে নারী ছিল অবহেলিত, অধিকারবঞ্চিত ও অসম্মানিত। কিন্তু ইসলাম নারীকে সম্মান, নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিয়েছে।

ইসলাম নারীকে মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন—সব ভূমিকায় সম্মানের আসনে বসিয়েছে।
রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"তোমার মায়ের পদতলে রয়েছে তোমার জান্নাত।"৬৫

এই হাদীস নারীর উচ্চ মর্যাদার চূড়ান্ত উদাহরণ।

ধর্ম নারীকে দিয়েছে জীবনের সঠিক পথ — কীভাবে চলবে, আচরণ করবে, পরিবার ও সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখবে।ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে শালীনতা, ইমান, ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও দায়িত্ববোধের।

ধর্ম নারীকে শুধু গৃহবন্দি রাখেনি; বরং তাকে শিক্ষা, কাজ, সমাজসেবা ও নেতৃত্বে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে,
তবে তা যেন হয় নৈতিকতা ও শালীনতার আলোকে। ধর্ম নারীকে দিয়েছে সম্মানিত পরিচয় ও জীবনদিশা। এই মর্যাদা ও দিকনির্দেশনাই তাকে করে তুলেছে আত্মবিশ্বাসী, সম্মানিত ও সমাজের প্রকৃত আলোকবর্তিকা।

নৈতিকতা নারীকে করে শক্তিশালী ও শ্রদ্ধেয়।

সততা, নম্রতা, দায়িত্ববোধ ও পরোপকারিতার মাধ্যমে নারী নিজেকে সমাজে মর্যাদার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যে নারী নৈতিকতার গুণে আলোকিত, তিনি সত্যবাদী, দায়িত্বশীল ও আত্মসম্মানবোধে দৃঢ়। তার শক্তি আসে বাহ্যিক ক্ষমতা থেকে নয়, বরং তার অন্তরের সততা ও নীতিনিষ্ঠা থেকে।নৈতিক নারী কখনও নিজের মর্যাদা কম হতে দেন না। তিনি অন্যায় ও প্রলোভনের কাছে নত হন না, বরং সত্যের পথে অবিচল থাকেন। তার আচরণ ও চরিত্র

অন্যদের কাছে শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। সমাজে এমন নারীকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালোবাসে ও সম্মান করে।

ইসলামও নারীর নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।
কারণ নৈতিক নারীই শান্ত পরিবার, সুস্থ সমাজ ও ন্যায়ভিত্তিক জাতি গঠনের মূলভিত্তি।নৈতিকতা নারীর প্রকৃত অলংকার। এটাই তাকে করে শক্তিশালী, মর্যাদাসম্পন্ন ও মানবতার আলোকবর্তিকা।

ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ নারী পরিবার ও সমাজকে আলোকিত করে।
একজন নৈতিক ও শিক্ষিত নারী যেমন নিজের জীবন সুন্দর করে, তেমনি পুরো প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ধর্মীয় চেতনা মানে শুধু নামাজ-রোজা নয় — বরং ন্যায়, সততা, সহমর্মিতা, দয়া ও দায়িত্ববোধে আলোকিত জীবনযাপন। যে নারী ধর্মীয় মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত, তিনি নিজের জীবনে যেমন শৃঙ্খলা আনেন, তেমনি তার প্রভাব পড়ে পরিবার ও সমাজে।

একজন ধর্মপ্রাণ নারী তার সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দেন, স্বামীকে সহায়তা করেন, এবং ভালোবাসা ও শান্তিতে পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তার চরিত্র ও আচরণ পরিবারে সৌহার্দ্য ও সম্মানের আবহ তৈরি করে।

যে নারী ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তিনি সমাজে সততা, ন্যায়বোধ ও মানবতার আলো ছড়ান। তিনি অন্য নারীদের অনুপ্রাণিত করেন ভালো কাজে, শিক্ষা ও নৈতিকতায় উন্নতির পথে।

ধর্মীয় নারী কখনো অন্যায়কে সমর্থন করেন না।তিনি শান্তি, সহমর্মিতা ও মানবকল্যাণের পথে সমাজকে এগিয়ে নেন। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ নারী এক একটি প্রদীপ —
যার আলোয় পরিবার হয় শান্ত, সমাজ হয় ন্যায়ভিত্তিক, আর মানবতা খুঁজে পায় প্রকৃত মর্যাদা।

ধর্ম ও নৈতিকতার সংমিশ্রণে নারীর উন্নয়ন হয় ভারসাম্যপূর্ণ।
শুধু জাগতিক বা বাহ্যিক অগ্রগতি নয়, নারীর উন্নয়নে প্রয়োজন আত্মিক ও নৈতিক বিকাশও। ধর্ম নারীকে দিয়েছে সঠিক পথনির্দেশ, আর নৈতিকতা দিয়েছে সেই পথ অনুসরণের শক্তি।

ধর্মের দিকনির্দেশনা নারীকে দেয় জীবনবোধ ও দায়িত্ববোধ। ইসলাম নারীকে শালীনতা, সততা, শিক্ষা ও সম্মানের পথ দেখিয়েছে। ধর্ম শেখায় — উন্নয়ন মানে শুধু স্বাধীনতা নয়, বরং দায়িত্বের সঠিক ব্যবহার। নৈতিকতা নারীকে করে আত্মনিয়ন্ত্রিত ও সম্মানিত। যে নারী নৈতিকতায় দৃঢ়, তিনি অন্যায় ও প্রলোভন থেকে দূরে থেকে নিজের মূল্যবোধ রক্ষা করতে পারেন।

সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে ভারসাম্যপূর্ণ নারী।ধর্ম তাকে দেয় দিকনির্দেশনা, নৈতিকতা দেয় আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা — ফলে সে হয়ে ওঠে আধুনিক, শিক্ষিত ও মানবিকতার আলোয় আলোকিত নারী। এমন নারী সমাজে ভারসাম্য, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। তিনি প্রযুক্তি ও জ্ঞান অর্জন করেন, কিন্তু আত্মা ও নীতির বন্ধন হারান না।

যে নারীর মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণ আছে,তিনি হয়ে ওঠেন সভ্যতার প্রকৃত স্থপতি — আলো ছড়ান জ্ঞান, চরিত্র ও মানবতার মাধ্যমে। এতে নারী আধুনিকতায় অগ্রসর হয়, কিন্তু নিজের মূল্যবোধ ও পরিচয় হারায় না।

যে নারী ধর্ম ও নৈতিকতার আলোয় নিজেকে গড়ে তোলে,
তিনি শুধু নিজের নয়, বরং পরিবার, সমাজ ও জাতির উন্নয়নের প্রেরণাও হয়ে ওঠেন।
তাঁর চরিত্রের আলোয় জেগে ওঠে সত্যিকারের মানবসভ্যতা।

রেফারেন্স:

১, সূরা আন নিসা, আয়াত ১৯
২, সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২
৩, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১
৪, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১
৫, সূরা আন-নাহল, আয়াত ৯৭
৬, সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৫
৭. সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯
৮. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭
৯, সূরা আত-তাকভীর, আয়াত ৮-৯
১০. সূরা আজ-জুমার, আয়াত ৯
১১. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৯৫
১২. সূরা আন-নূর, আয়াত ৩০-৩১
১৩. সূরা আর-রূম, আয়াত ২১
১৪. সূরা আত-তাওবা, আয়াত ৭১
১৫. ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৪
১৬. সূরা আজ-জুমার, আয়াত ৯
১৭. সূরা- আলাক, আয়াত-১-৫
১৮. সহিহ বুখারি, হাদীস ৫০২৭
১৯. সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ০১
২০. মুসলিম শরীফ, হাদিস নং—১৪৬৭
২১. ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৪
২২. সূরা আজ-জুমার, আয়াত ৯
২৩. সূরা নিসা, আয়াত ০৭
২৪. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২
২৫. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪
২৬. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২
২৭. সূরা আহযাব, আয়াত ৫৩
২৮. সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯
২৯. সূরা নূর, আয়াত ৩১

৩০. সহিহ মুসলিম হাদীস-২১৭৩
৩১. সহিহ মুসলিম হাদীস-২১৭২
৩২. সহিহ মুসলিম হাদীস-২১৭১
৩৩. সূরা বাকারা, আয়াত ১৭৩
৩৪. জামি‘ আত-তিরমিজি, হাদীস: ৩৮৯৫, সুনান ইবন মাজাহ,হাদীস: ১৯৭৭
৩৫. সহিহ বুখারি, হাদীস: ২০৭২
৩৬. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫
৩৭. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪
৩৮. সূরা আহযাব : আয়াত ৫০
৩৯. সুনান দারাকুতনি, বাইহাকি, সুনানুল কুবরা
৪০. ইবনু মাজাহ
৪১. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪
৪২. সূরা নিসা, আয়াত ২০
৪৩. মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ৪/৫২১-৫২২, হাদীস-৭৫০১
৪৪. সুনানে বায়হাকী : ৭/৩৮১, হাদীস-১৪৩৪১
৪৫. মুসলিম হাদিস :১৪২৬
৪৬. মাউসুআতু হায়াতিস সাহাবিয়াত, মুহাম্মদ সাঈদ মুবাইয়াদ: পৃ. ৬২৪
৪৭. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৬/১৮৫, হাদীস : ১০৪৪৩
৪৮. মাজমাউয যাওয়াইদ : ৪/৫২৩, হাদীস : ৭৫০৭
৪৯. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭
৫০. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২
৫১. সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০
৫২. সহিহ বুখারি — হাদীস ৬৭৮৩
৫৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯
৫৪. তিরমিজি, হাদীস ১১৬২
৫৫. সহিহ বুখারি ৫৯৭১, সহিহ মুসলিম ২৫৪৮
৫৬. সূরা আর-রূম, আয়াত ২১
৫৭. তিরমিজি, হাদীস ১১৬২
৫৮. সহিহ মুসলিম, হাদীস-২৬৩১
৫৯. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫
৬০. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩

৬১. সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯
৬২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩
৬৩. জামি‘ আত-তিরমিজি, হাদীস: ৩৮৯৫, সুনান ইবন মাজাহ,হাদীস: ১৯৭৭
৬৪. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫
৬৫. সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ৩১০৪